শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের
শিক্ষাচিন্তার
প্রয়োগ

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন – শ্রীনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রয়োগ

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

AHEAD Initiatives
Addressing Hunger Empowerment And Development

Santiniketan – Sriniketan
Rabindranather sikshachintar proyog

Santiniketan – Sriniketan
(Rabindranath's pedagogical thought in practice)
By Sandip Bandyopadhyay

(c) লেখক

অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভ্‌স্‌ – সংস্করণ (পরিমার্জিত), ২০১৪

প্রকাশকঃ

নবদিশা

c/o AHEAD Initiatives
৫/১/২/জি কর্নফিল্ড রোড (বালিগঞ্জ)
কলিকাতা – ৭০০০১৯

প্রচ্ছদঃ রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি অবলম্বনে

মূল্যঃ ৫০/-

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রণালীটি ঠিক কেমন ছিল, শান্তিনিকেতনে কীভাবে পড়ানো হতো, সে-বিষয়ে আমাদের প্রভূত কৌতূহল আছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সে-তুলনায় কমই হয়েছে, এবং কিছু অতিকথাও প্রচলিত আছে। শান্তিনিকেতনে গাছতলায় ক্লাস হতো—এইটুকুই কেবল শোনা যায় এখনো। রবীন্দ্রনাথ নিজে শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বেশি লেখেননি; তবে তাঁর চিঠিপত্রে এবং শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিকথায় অজস্র সূত্র ছড়িয়ে আছে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতি শুধু রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবন নয়, অন্যান্য শিক্ষকদের প্রবর্তনাও পদ্ধতিটিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি যতটা সুপরিচিত, শ্রীনিকেতনের 'শিক্ষাসত্র' সে-তুলনায় অনেক কম আলোচিত; অথচ একটা সময় রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের বিদ্যালয়টিকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। গ্রামের দরিদ্র শিশুদের কথা মনে রেখে এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয়। উদ্দেশ্য ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান নয়; শিশুদের উত্তর-জীবনে স্ব-নির্ভর হয়ে উঠতে সাহায্য করা। যেভাবে এই স্কুলটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল, আজকের বিচারেও তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত বলে গণ্য হতে পারে। বিকল্প শিক্ষা নিয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করেন, শিক্ষাসত্রের পরিকল্পনায় তাঁরা এক অভিনব প্রয়াস দেখতে পাবেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন নয়, তাঁর শিক্ষাচিন্তার দুটি প্রয়োগক্ষেত্র নিয়েই আমাদের এই রচনাটি।

দুঃখের বিষয়, বইটি প্রকাশিত হচ্ছে এমন একটা সময়ে যখন শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে; দূষিত হয়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক পরিবেশও। শিক্ষাসত্র-ও এখন গতানুগতিক একটি বিদ্যালয় ছাড়া কিছু নয়। যে-মহান কর্মপ্রয়াসটি আজ নানাভাবে

বিকৃত হয়ে গেছে, তার আদিরূপটি কেমন ছিল, তার একটা প্রাথমিক ধারণা এই বই থেকে পাওয়া যাবে বলে আশা করি।

১৯৯৯ সালে এ-বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে কিছু দুর্লভ নথিপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভবনের সেই সময়কার অধ্যক্ষ স্বপন মজুমদার এবং গ্রন্থাগারিক সুপ্রিয়া রায়ের কাছে আমি এজন্য কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক মজুমদার কিছু ছবি পুনর্মুদ্রণের অনুমতিও দিয়েছিলেন। রচনাটির কিছু অংশ আগে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলিকে পরিমার্জিত করে একটি বইয়ের আকারে প্রকাশ করেন 'সূত্রধর' (২০০৮)। 'অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভ্স্'-এর উৎসাহে পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হলো। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন : ব্রহ্মচর্যাশ্রম

শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে, আর এর ন-বছর পর ১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে গড়ে উঠল তাঁর বিদ্যালয় : ব্রহ্মচর্যাশ্রম। শিক্ষা নিয়ে ভাবনাচিন্তা এর মাঝখানে চলছিলই; ১৮৯৮-৯৯ নাগাদ শিলাইদহে নিজের সন্তানদের জন্যে তিনি একটি গৃহবিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন; তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি; সেই অসম্পূর্ণ কাজ-ই যেন আর-একটু বড়ো আকারে শুরু হলো শান্তিনিকেতনে। কবিপুত্রের সঙ্গে আরও চার/পাঁচজন ছাত্র যোগ দিলেন আশ্রম-বিদ্যালয়ে।

'শিক্ষার হেরফের' রচনার আগেই শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু ছিন্ন উক্তি 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' (১৮৯১) এবং আরও দু-একটি রচনায় পাওয়া যায়। তাঁর প্রধান আপত্তি তখন ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত, এই শিক্ষা 'কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না'; তিনি চান বঙ্গবিদ্যালয় সারা বাঙলায় প্রসারিত হোক। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ হলো। রবীন্দ্রনাথের বিচারণায় বিষয় এখন শিক্ষার তত্ত্ব আর প্রণালী দুটোই। প্রচলিত শিক্ষার প্রধান ত্রুটিগুলি রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করলেন এইভাবে : এই 'শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই', এই শিক্ষা 'জীবনের সহিত অসংলগ্ন'; 'আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া'।[১]

এর দু বছর পর (১৮৯৪) ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'যে শিক্ষায় মানুষের মনকে সচেতন করে দেয়, বিশ্বসংসারকে নানাভাবে অনুভব করবার শক্তি সঞ্চার করে, সেইটেই হচ্ছে মানুষের পক্ষে খুব একটা মূল্যবান শিক্ষা।'[২] ১৮৯৮ সালে *ভারতী* পত্রিকার একটি রচনায় তিনি আবার আক্ষেপ করে বলেন : 'বিদ্যালয়ে আমরা যাহা লাভ করি, সমাজে তাহার কোন চর্চা নাই। .....(এই) বিদ্যা আমাদের প্রাণের সহিত, রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় না।'[৩]

আদর্শ শিক্ষাপ্রণালী কেমন হতে পারে তার একটা আভাসও রবীন্দ্রনাথ ১৮৯২ সালের প্রবন্ধটিতে দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সেই অনুকল্প শিক্ষার প্রধান সূত্র হলো : 'অত্যাবশ্যক শিক্ষা'-র সঙ্গে 'স্বাধীন পাঠ'-ও মিশিয়ে দিতে হবে,

যাতে শিক্ষার্থীর 'গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে' বিকশিত হতে পারে এবং ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভাবশিক্ষার সমন্বয়ে 'সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য' স্থাপিত হতে পারে। বিদ্যালয় শুরু করার কয়েক মাস আগে তিনি আরও স্পষ্ট করে জানালেন, 'যাহাতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের বুদ্ধি, শরীর ও চরিত্রের উন্নতি হয় সেজন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইব।' তাঁর প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে 'ব্যায়ামচর্চার যথেষ্ট আয়োজন'-ও থাকবে বলে জানা গেল।[৪] শিক্ষাভাবনার এইরকম আদিকল্প মনে রেখেই তিনি নিজের বিদ্যালয়টিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, আশা করতে পারি।

আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল পাঁচজন ছাত্র আর তিনজন নিয়মিত শিক্ষককে নিয়ে। উদ্বোধনী দিবসে ছাত্রদের দীক্ষাদান করা হয়। দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রাচীন বৈদিক আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে 'সেই শিক্ষা, সেই ব্রত' গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন : 'তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না.....সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন, এইটে নিশ্চয় জেনে, আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে।'

এইরকম একটি উপদেশময় ভাষণের মর্মার্থ বালক ছাত্রদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব কিনা, সে-প্রশ্ন আমাদের থেকেই যায়। *জীবনস্মৃতি*-তে তাঁর নিজের বিদ্যালয়-জীবনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ইংরাজি গানের সুরে 'কী সমস্ত কবিতা' আবৃত্তি করা হতো — 'সেই একটা অর্থহীন একঘেয়ে ব্যাপারে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছু সুখকর ছিল না।' তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রারম্ভিক ভাষণ এবং পরে সকাল-সন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্রসহযোগে উপাসনার অনুষ্ঠানও ছাত্রদের 'অর্থহীন' মনে হতে পারে কিনা, রবীন্দ্রনাথ বোধহয় ভেবে দেখেননি। প্রমথনাথ বিশীর রচনায় এরকম ইঙ্গিত আছে যে, ছাত্ররা ভাষণ শেষ হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে অপেক্ষা করত।[৫] পরে একবার ওই অনুষ্ঠান নিয়ে বিতর্কও উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন : তাঁর উদ্দেশ্য হলো 'জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য' ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়া।[৬]

রবীন্দ্রনাথ এখানে নিঃসন্দেহে তাঁর নিজের আদর্শকে শিশুদের উপর আরোপ করেছেন। তাঁর মানসলোকে শিক্ষার যে-আদর্শ প্রতিমান ছিল, সেই অনুসারেই

তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়কে। শিক্ষাচিন্তার ইতিহাসে দেখা যায়, এরকম ঘটনা বারবারই ঘটেছে। দার্শনিকরা তাঁদের নিজেদের দর্শনের আদলেই নির্মাণ করতে চেয়েছেন শিক্ষার প্রতিমা। ফ্রোয়েবল তাঁর শিক্ষাপ্রস্তাবে ধর্মশিক্ষার আয়োজন রেখেছিলেন; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, এই শিক্ষা শিশুমনে 'মহাজাগতিক ঐক্যের' একটা ধারণা সঞ্চারে সাহায্য করবে, এবং তার প্রয়োজনও আছে।[৭] রবীন্দ্রনাথও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সম্মিলনের কথা বলেছেন; তাঁরও আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, বিশ্বনিয়মে কোনো ত্রুটি নেই; বিশ্বশক্তি সেই 'ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই' (একটি) রূপ।[৮] প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্য, জগতের সর্বত্র ঈশ্বরের উপস্থিতির চেতনা তাঁর দর্শনের আদিসূত্র। আশ্রমবিদ্যালয়ের আদর্শে তাঁর সেই জীবনদর্শনেরই প্রতিফলন দেখতে পাই আমরা।

প্রাচীন তপোবন-জীবনের আদর্শেই রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়কে। রুশো যেমন প্রকৃতির জীবনকেই আদর্শ মনে করতেন, রবীন্দ্রনাথেরও ধারণা ছিল আরণ্যক জীবন মানুষকে এক আশ্চর্য 'প্রৈতি' দিয়েছিল, 'বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে' এক 'অবারিত যোগ'-স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।'[৯]

রবীন্দ্রনাথের আর-একটি লক্ষ্য ছিল শিক্ষার ভিতর দিয়ে স্বদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা সত্যকার বোধ জাগিয়ে তোলা। আশ্রমের উদ্বোধনী ভাষণে তাঁর প্রথম বাক্যটিই ছিল এই : 'অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ এই ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল — তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন।' হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ববাদচিন্তার প্রভাব এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের ওপর বেশ প্রবলই ছিল; বিদ্যালয় স্থাপনের পরের বছরে লেখা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তখন বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধালু ছিলেন। ধর্মকে মনে করতেন, মানবসভ্যতার আদর্শ এবং বিশ্বাস করতেন, 'ভারতবর্ষীয় প্রণালীই' শ্রেষ্ঠ; কারণ ভারতবর্ষ 'ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে।' তপোবনের আদর্শ যে একটা 'পুরাণকথা', তা রবীন্দ্রনাথও জানতেন; তবু ওই পুরাণকথাকে অবলম্বন করেই তিনি স্বদেশের একটি আদর্শ মূর্তি রচনা করতে চেয়েছিলেন। সেই সময়কার হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে-মতাদর্শ,

রবীন্দ্রনাথের চিন্তালোক তখনো তার ভেতরেই নিমজ্জিত হয়ে আছে। সেই 'ঝোঁকে তিনি ভারতবর্ষের সমস্তই আশ্চর্য ও রমণীয় করিয়া দেখিতে লাগিলেন।'[১০]

ক্রমে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত স্বদেশী আন্দোলনের পর হিন্দুবাদী ভাবনার সংক্রাম থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছেন, আমরা জানি। ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতার সময় থেকেই তাঁর চিন্তায় একটা গঠনমূলক স্বদেশী ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তিনি আত্মশক্তি এবং স্ব-উদ্যোগের কথা বলছেন; কিন্তু তপোবন-জীবনের প্রতি তাঁর দুর্বলতা তারপরও রয়ে গেছে, দেখতে পাই। ১৯১২ সালে জগদানন্দ রায়কে লিখেছেন, 'ছেলেদের মন যাতে মুক্ত জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, ...এইটে আমি একান্তমনে কামনা করি।'[১১] রবীন্দ্রনাথের তপোবন-ভাবনাকে তাই কেবলমাত্র হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তার একটি প্রতীক হিসাবে বিচার করা বোধহয় ঠিক হবে না। ওই ভাবনার পিছনে তাঁর নিজস্ব প্রকৃতিচিন্তা আর সৌন্দর্যচেতনার প্রভাবও খুব বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, আদর্শ বিদ্যালয় হবে 'নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে, গাছপালার মধ্যে', শিক্ষার লক্ষ্য হবে : 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ'; কেবল ইন্দ্রিয়ের বা জ্ঞানের শিক্ষা নয়, 'বোধের শিক্ষা'।[১২]

একটি তপোবনোপম পরিবেশ তাঁর বিদ্যালয় ছাত্রদের সত্যিই দিতে পেরেছিল। আশ্রম-বিদ্যালয়ের গোড়ার দিকে কিছুদিনের জন্যে 'শখের মাস্টারি' করতে এসেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। তাঁর লেখায় আশ্রমের বর্ণনা পাই এরকম : 'খোলার চালে আর মাটির দেওয়ালে তৈরি ছোট ছোট ঘরের লাইনবন্দী এক লম্বা কুটির। .....সামনে ধূধূ করছে কাঁকরভরা খোলা মাঠ।'[১৩] প্রমথনাথ বিশীর লেখায় পড়ি : 'গাছের তলায় ক্লাস বসিত। কেহ জামগাছতলায় ক্লাস লইতেন। কেহ বটগাছতলায়, কেহ আমবাগানের মধ্যে। তেজেশবাবু ক্লাস বসিত নূতন বাড়ির কাছে একটা গোলকচাঁপা গাছের তলে।'[১৪] সুন্দর একটি ছন্দে বাঁধা ছিল আশ্রমের জীবন; তবে প্রমথনাথের বিবরণ পড়লে বোঝা যায়, দিনসূচিটি ছিল 'নিয়মের দ্বারা একেবারে ঠাসা, ভর্তি — কোথাও যেন নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই।'[১৫]

আনন্দ আর অবসর

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় দুটি শব্দ বারবার এসেছে : আনন্দ আর অবসর বা মুক্তি। আনন্দ আশ্রমজীবনে ছিল, সর্বকাজে ব্যাপ্ত হয়েই ছিল; মুক্ত প্রান্তরে অবাধে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতাও ছাত্ররা পেত; তবে একটা কঠোর নিয়মের অনুশাসনও আবার আশ্রমজীবনকে বেশ কিছুটা বেঁধে রেখেছিল। উপাসনার সময় গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণে সকলেরই অধিকার ছিল; কিন্তু প্রার্থনাকালীন পোশাকে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ বর্ণভেদ বজায় রাখা হতো। আহারের সময় ব্রাহ্মণ ছাত্ররা বসত স্বতন্ত্রভাবে।[১৬] বৈষম্যপীড়িত যে-শাসনব্যবস্থা, পরিবেশকে সেখানে যথার্থ উদার বলা চলে না।

ছাত্রদের প্রতিদিনের জীবনও ছিল কঠোর নিয়মশাসিত। তারা সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘর পরিষ্কার করে, প্রাতঃকৃত্য সেরে, শুদ্ধ বস্ত্র পরে প্রার্থনার জন্য সমবেত হতো। প্রার্থনার পর প্রাতরাশ। তারপর কিছুক্ষণ বাগানে কাজ করার পর ক্লাস শুরু হতো। ক্লাসে পড়াশোনার শেষে খেলা বা গান। মধ্যাহ্নভোজের পর আবার পড়াশোনা। বিকেলে খেলাধুলো। সন্ধ্যায় আবার উপাসনা। তারপর গান-গল্প। 'গুরুদেবের' সান্নিধ্য ছাত্ররা বিশেষ করে পেত এইসময়।[১৬ক]

বেশ বোঝা যায়, আনন্দ বা অবসরের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে সচেতনভাবে। কিন্তু সমস্ত প্রণালীটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে একটি শৃঙ্খলানীতি। প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন, 'প্রথম আমলে ডিসিপ্লিনের কিছু যেন কড়াকড়ি ছিল।'[১৭] একবার আকাশে মেঘ দেখে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ক্লাস ছুটি দিয়ে দেন; তারপরই জগদানন্দ রায়কে আসতে দেখে তিনি ভয় পেয়ে ভাবেন, জগদানন্দ হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন। জগদানন্দ কিন্তু ছুটি অনুমোদন করেছিলেন। তবু স্বস্তি না পেয়ে সুধাকান্ত ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথকে লিখে জানিয়ে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত দিয়েছিলেন এরকম : 'আর সকল শক্তির চেয়ে খুশি হয়ে ওঠবার শক্তিটা ওদের যেন পুরোপুরি ফুটে উঠতে পায়।'[১৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার কথা বারবার নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে এইটুকু স্বাধীনতা যে থাকবে, তা একরকম স্বতঃপ্রমাণিত বলা যায়; তবু একদিন নির্ধারিত সময়ের আগে ক্লাস ছুটি দিয়ে একজন শিক্ষক এতটাই উদ্বিগ্ন বোধ করেছেন; এ-থেকে বোঝা যায়, শান্তিনিকেতনে নিয়মের

শাসন কিছু কঠোরই ছিল। নিয়মভাঙার প্রবণতা ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের মধ্যেই দেখা যেত।

প্রথম কুড়ি বছরে আশ্রম-বিদ্যালয়ে কোনো মুসলমান ছাত্র ছিল না। গায়ত্রীমন্ত্রসহযোগে উপাসনার রীতি তাই একরকম মানিয়ে গিয়েছিল। জীবনযাপনপ্রণালীতে হিন্দুভাব থাকলেও আশ্রমে কোনো একটি বিশেষ ধর্মের পরিকীর্তন করা হতো না। ১৯০৯ সালে ক্ষিতিমোহন সেনকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বলে দেন, ছাত্রদের যেন কোনো একটি বিশেষ ধর্মমতে – 'সাম্প্রদায়িক পন্থায়' চালনা করা না হয়। কিন্তু অব্রাহ্মণ শিক্ষককে ছাত্ররা প্রণাম করবে কিনা, তাই নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথকে একরকম আপোস করতে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ ছিল : 'যাহা হিন্দুসমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না।'[১৯]

পাঁচজন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয় শুরু হয়েছিল। তিনবছর পর ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ২১ মাত্র। সুসংহত একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বেশ কয়েকবছর সময় লেগেছিল। ১৯০২ সালের শেষ দিকের একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, কারণ গণিতের ক্লাস ঠিকমতো হচ্ছে না। এর কয়েকমাস পরেই শমীন্দ্রনাথ পিতাকে জানাচ্ছেন, ইংরেজি-বাঙলা-ভূগোল-ইতিহাস কিছুই পড়া হচ্ছে না; শিশুশ্রেণীর 'পড়াশোনা এক রকম বন্ধ হয়েই আছে।'[২০]

নানা কারণেই ছাত্রদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটেছিল। অর্থাভাব তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল শিক্ষক-সমস্যা। পারিবারিক কারণে রবীন্দ্রনাথকে মাঝেমাঝেই বোলপুর ছেড়ে অন্যত্র যেতে হতো। বিদ্যালয় স্থাপনের একবছরের মধ্যেই নিদারুণ ট্র্যাজেডি নেমে আসে তাঁর জীবনে। কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় ২৯ নভেম্বর, ১৯০২। আর তার এক বছরের মধ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ — রবীন্দ্রনাথ হারালেন দ্বিতীয় কন্যা রেণুকাকে।

নানা কারণে তিনি নিজে যথেষ্ট সময় দিতে পারছেন না, এটা বুঝে ১৯০২ সালেই তিনি শিক্ষকদের নিয়ে অধ্যক্ষসভা গঠন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরও শিক্ষক-সমস্যা থেকেই যায়। একজন করে শিক্ষক কাজে যোগ দেন এবং কিছুদিন পরে ছেড়ে চলে যান—এই সমস্যা প্রথম থেকেই ছিল। আশ্রমের

সূচনাপর্বে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন তাঁর অনুগামী রেবাচাঁদ (অণিমানন্দ)। মাত্র সাত মাস পরেই প্রথমে রেবাচাঁদ এবং পরে ব্রহ্মবান্ধবও বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। রেবাচাঁদ ছাত্রদের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করছেন, এমন গুঞ্জন উঠেছিল। তাঁর এবং ব্রহ্মবান্ধবের কঠোর শিক্ষাপ্রণালীও রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি বলে জানা যায়।[২১] ১৯০২ সালেই প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যান। অধ্যাপনার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কুঞ্জলাল ঘোষকে। তবে কয়েকজন নতুন শিক্ষকও ততদিনে এসে গেছেন: জগদানন্দ রায়, অবিনাশচন্দ্র বসু, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়। কিছু পরে যোগ দেবেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিতচন্দ্র সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী। ক্ষিতিমোহন সেন এসেছিলেন ১৯০৮ সালে।

শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্ক খুব স্বাস্থ্যকর ছিল, বলা যায় না। ১৯১১ সালের বার্ষিক সভায় অজিতকুমার চক্রবর্তী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'তখনকার আবহাওয়া যে খুব নির্মল উদার ছিল, এমন তো মনে হয় না।'[২২] রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়, অকালপ্রয়াত শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ও শেষের দিকে কিছুটা নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। রবীন্দ্রনাথের পরিচালন-ব্যবস্থায় 'অন্যায় ও দুর্বলতা' আছে, এমন অভিযোগও উঠেছিল। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও কোনো-কোনো শিক্ষকের পড়ানোর ধরন বা ছাত্রদের প্রতি আচরণ পছন্দ করেননি। একসময়ে তাঁর এমনও মনে হয় যে, বিদ্যালয়ে 'কতকগুলি জঞ্জাল' জমেছে।[২৩]

এইসব নানা কারণে প্রথম কয়েক বছর বিদ্যালয়ে একটা সুস্থিত পরিবেশ বা সুগঠিত শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে উঠতে পারেনি। মুক্তশিক্ষার একটা দার্শনিক প্রত্যয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন। কিন্তু ঠিক কীভাবে পড়ানো হবে, হাতে-কলমে কাজের পদ্ধতিটি কেমন হবে, সে-বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নীতি প্রথমদিকে অন্তত ছিল না। শিক্ষকরা প্রত্যেকে তাঁদের নিজস্ব বিশ্বাস এবং ধারণা অনুযায়ী পড়াতেন। ফলে এক-এক জনের ক্লাস এক-একরকম হতো।

'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'-এ রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের শিক্ষণপদ্ধতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। সতীশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ ছাত্র রথীন্দ্রনাথ-ও লিখেছেন, তাঁর 'পড়াবার এমন ধরন ছিল, কঠিন সাহিত্য পড়ছি বলেই মনে হতো না।'[২৪]

কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে সতীশচন্দ্রের ধারণা অনেকটাই ভাববাদী ছিল বলে মনে হয়। তাঁর নিজের লেখাতেই আছে, ছাত্রদের মনে যাতে একাগ্রতা আসে, তার জন্য তিনি তাদের গায়ত্রীমন্ত্র এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কথা চিন্তা করার পরামর্শ দিতেন।[২৫] তাঁর ওইসব উপদেশের তাৎপর্য শিশুদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়।

সুপণ্ডিত মোহিতচন্দ্র সেনও 'পুঁথির শিক্ষার' ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি ছিল একটু বেশিরকম উচ্চমার্গের।[২৬] ছাত্রদের বাস্তব অবস্থা এবং বয়সোপযোগী বোধক্ষমতার কথা তিনি মনে রাখতেন না। আর-একজন শিক্ষক প্রাতঃকালে ছাত্রদের 'লোকেশ চৈতন্য মায়াধিদেব' মন্ত্র উচ্চারণ করতে শেখাতেন। পরিণত বয়সে সুধীরঞ্জন দাস লিখেছেন, সেই উপাসনামন্ত্রের তাৎপর্য উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা তখন তাদের ছিল না, থাকার কথাও নয়।[২৭]

সব শিক্ষকের পড়ানোর ধরনই যে আর্কষণীয় ছিল, এমনও নয়। শরৎ রায়ের গণিতের ক্লাস অনেক ছাত্রের কাছেই ভীতিজনক ছিল। পাণিনির ব্যাকরণ-পাঠও বেশ পীড়াদায়ক হয়ে উঠত, স্মরণ করতে পারেন প্রমথনাথ বিশী।[২৮] নগেন্দ্রনাথ রায় নামে জনৈক শিক্ষক ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী। তিনি ছাত্রদের গাছে-চড়া ইত্যাদি পছন্দ করতেন না। কুঞ্জলাল ঘোষেরও 'ভাবের দিকে বেশি ঝোঁক না দিয়া কাজের দিকে কড়াক্কড়ি করার' প্রবণতা ছিল।[২৯]

শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এইসময় বিশেষ কিছু লেখেননি। তবে তিনি ক্লাস নিতেন। শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ বা 'গুরুদেবের' প্রসঙ্গ বারবারই এসেছে। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, শিশু শ্রেণীতেই রবীন্দ্রনাথ শেলী-কীট্‌সের কবিতা পড়াতেন এবং 'প্রশ্ন করিয়া করিয়া বালকদের মুখ দিয়া ঠিক শব্দটি বাহির করিয়া লইতেন।' পপুলার সায়েন্সের বই থেকে তাঁর বিজ্ঞান পড়ানোর কথাও প্রমথনাথ উল্লেখ করেছেন।[৩০]

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর লেখা থেকে জানতে পারি, রবীন্দ্রনাথ 'ঘড়ি ধরা সময়ে' ক্লাসে আসতেন এবং পড়ানোর সময় কাউকে অন্যমনস্ক হতে দিতেন না।[৩১] বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 'চিত্রকর' গ্রন্থে (পৃ ৪৩) উল্লেখ করেছেন,

রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে ছাত্রদের খাতা সংশোধন করে দিতেন। অমিতা সেন স্মরণ করতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি কবিতা এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের মহাভারত' থেকে পড়াতেন।[৩২] উপেন্দ্রকিশোরের ওই বইটি এবং রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' তখন পাঠ্য ছিল। অমিতা সেন বলেছেন বালিকা বিদ্যালয়ের কথা। বালিকা-বিভাগ শুরু হয়েছিল ১৯০৮ সালে; কিন্তু দু-বছর বাদে জনৈক ছাত্রের আত্মহত্যার পর বিদ্যালয়টি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।* বালিকা বিদ্যালয়টি রবীন্দ্রনাথের বেশ দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। আশ্রমের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা আর শিক্ষকদের পারস্পরিক মনান্তর-সমস্যার মীমাংসা করতেই তিনি প্রথম কয়েক বছর ব্যস্ত ছিলেন। তাই বোধহয় শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে কোনো উদ্দীপক রচনা তাঁর কাছ থেকে এই পর্বে পাওয়া যায়নি। তবে কে কেমন পড়াচ্ছেন, সে-বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। শিক্ষকদের সঙ্গে মতালাপও চলত।

বিজ্ঞানশিক্ষা

প্রথমদিকের শিক্ষকদের মধ্যে জগদানন্দ রায়ের পদ্ধতিতেই একটা মৌলিকত্ব ছিল। এছাড়া অবিনাশ বসুও ফ্রোয়েবেলের পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি খুব বেশিদিন কাজ করেননি।

জগদানন্দ রায় প্রথম জীবনে কাজ করতেন শিলাইদহের জমিদারি কাছারিতে। তারও আগে অল্প কিছুকাল শিক্ষকতাও করেছিলেন তিনি বিজ্ঞান-লেখক হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর 'গল্পচ্ছলে সরস করে' বিজ্ঞানের কথা বলার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি তাঁকে কাছারি থেকে সরিয়ে বোলপুরের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। একইভাবে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে তাঁকেও তিনি পতিসর থেকে এনে বিদ্যালয়ে নিয়োগ করেন।

এখনকার পরিভাষায় যাকে 'নন-ফরমাল' শিক্ষাপদ্ধতি বলা হয়, শান্তিনিকেতনে তার প্রবর্তন করেন জগদানন্দ রায়। ছাত্রছাত্রীদের তিনি গ্রহনক্ষত্র চেনাতেন খোলা মাঠে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। আশ্রমের একটি ল্যাবরেটরি ছিল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি উপহার দিয়েছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা। জগদানন্দের

* বালিকা বিদ্যালয়টি আবার শুরু হয় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর, ১৯২২ সালে। ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গেই পড়াশোনা করত।

শারীরশিক্ষার ক্লাসে থাকত একটি কঙ্কাল। আমাদের মনে পড়ে যায়, রবীন্দ্রনাথও শৈশবে অস্থিবিদ্যার পাঠ নিয়েছিলেন নরকঙ্কাল-সহযোগে, ক্যাম্‌বেল মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রের কাছে।

জীবনস্মৃতি-তে পড়ি, রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞান শেখাতেন সীতানাথ দত্ত। তাঁর 'যন্ত্র-তন্ত্র সহযোগে' বিজ্ঞানশিক্ষণ বালক রবির কাছে 'বিশেষ ঔৎসুক্যজনক' ছিল। হাতে-কলমে বিজ্ঞানশিক্ষার সুযোগ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররাও পেয়েছিল জগদানন্দ রায়ের কাছ থেকে। জগদানন্দ রায়ের শিক্ষাপদ্ধতির একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় সুধীরঞ্জন দাসের স্মৃতিকথায়।[৩৩] মেঘ-বৃষ্টি কেমন করে হয়?—শিক্ষক বোঝাচ্ছেন লেকচার দিয়ে নয়, হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়ে। প্রথমে একটি পাত্রে জল নিয়ে তাপ দিয়ে বাষ্প করা হলো। সেই বাষ্প আর-একটি পাত্রে ধরে রাখা হলো। তারপর ঠান্ডা জল ঢেলে সেই বাষ্পকে আবার জলের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো। সূর্যের সাদা আলো আসলে সাতটি রঙের সমাবেশ। সেটা বোঝানো হলো একটা সাতরঙা চাকা খুব জোরে ঘুরিয়ে। দেখা গেল ঘুরন্ত চাকতিতে কোনো রঙ আলাদা করে ধরা পড়ছে না। চাকতিটিতে সাতটা রঙ থাকলেও সেটা তখন সাদা-ই দেখাচ্ছে।

আজকের দিনে এই পরীক্ষাগুলো হয়তো খুবই সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু একশো বছর আগে এইভাবে বিজ্ঞান পড়ানোর কথা অনেকে কল্পনাই করতে পারতেন না। ঔপনিবেশিক শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কমই ছিল। বিদ্যালয়স্তরে পরীক্ষার সাহায্যে বিজ্ঞানশিক্ষার কথা ভাবাই যেত না। সেইরকম একটি সময়ে বিজ্ঞানশিক্ষার এক দিগন্তরিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন জগদানন্দ। বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব এবং আবিষ্কারের কাহিনি তিনি সহজ-সরল করে ছাত্রদের শোনাতেন, ছোটো-ছোটো প্রবন্ধও লিখতেন। ১৯ মে, ১৯১০ বাঙলার আকাশে হ্যালির ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা সেই অসামান্য দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করেছিল দূরবীক্ষণে চোখ রেখে।[৩৪] পরে ঘটনাটি নিয়ে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন জগদানন্দ রায়। ১৯১১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'প্রকৃতি পরিচয়' রচনাসংকলনটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলীর উদ্দেশে।

শান্তিনিকেতনের একটি বিশিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলার পিছনে জগদানন্দ

রায়ের ভূমিকাই ছিল প্রধান। পরে এই ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন নেপালচন্দ্র রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কালীমোহন ঘোষ এবং উইলিয়ম স্ট্যানলি পিয়রসন। নেপালচন্দ্র এবং প্রভাতকুমার বিদ্যালয়ে যোগ দেন ১৯০৯-১০ সালে। বিদেশ থেকে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রশিক্ষণ নিয়ে কালীমোহন ঘোষ ফিরে আসেন সম্ভবত ১৯১৪ সালে। আর ওই বছরেই সি এফ অ্যান্ড্রুজের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যোগ দেন পিয়রসনও। এঁদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে এবং প্রত্যেকের স্বকীয় চিন্তার সমন্বয়ে ক্রমে গড়ে ওঠে শান্তিনিকেতনের একটি নিজস্ব শিক্ষাপ্রণালী।

শিক্ষাপদ্ধতি : অন্যান্য দিক

১৯০৯-১০ সাল থেকেই শান্তিনিকেতন একটা সুগঠিত রূপ পেল এবং বিদ্যালয়জীবনে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো বলা যায়। স্বদেশী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতেও একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও তিনি দেখেছিলেন, যে-আদর্শ নিয়ে বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন, নানা কারণে তা ধরে রাখা যাচ্ছে না। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, ছাত্রদের কাছ থেকে কোনো বেতন নেওয়া হবে না। কিন্তু কিছুদিন পরেই অনুভব করা গেল, 'ছাত্রদের তাপসকুমার সাজানো যায় কিন্তু শিক্ষকেরা তো আর তপস্বী নন।' অতএব বেতন ধার্য হলো, মাসে পনেরো টাকা।[৩৫] আশ্রমকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে একটা দ্বীপের মতো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু দেখা গেল, শিক্ষকরা অনেকেই এই সমাজ-বিচ্ছিন্ন বিদ্যালয়ের তত্ত্ব মেনে নিতে পারছেন না।[৩৬] রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সঙ্গে শিক্ষকদের এই বিরোধ আরও স্পষ্ট আকারে দেখা দিয়েছিল পরে, ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়। স্বদেশী আন্দোলনের অনুভাব আশ্রম-বিদ্যালয়ে সঞ্চারিত হতে দেননি রবীন্দ্রনাথ; তবে কালীমোহন-নেপালচন্দ্র এবং হীরালাল সেনের মতো স্বদেশীকর্মীকে তিনি জেনেশুনেই বিদ্যালয়ে স্থান দিয়েছিলেন; গোয়েন্দা পুলিশের নজর যে এইসময় শান্তিনিকেতনের ওপর ছিল, তা-ও আমরা জানি। আন্দোলনের সেই আলোড়িত পর্বে বেশ কিছু ছাত্র বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়; রবীন্দ্রনাথও (১৯০৭-৮) মাঝে মাঝে শিলাইদহে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ১৯০৪ সালে বসন্তরোগের ভয়ে বিদ্যালয়টি কিছুকালের জন্য

শিলাইদহে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল। সব মিলিয়ে নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছিল বিদ্যালয়-জীবন। সেইসব অনিশ্চয়তা আর বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে বিদ্যালয়ে আবার একটা সংগঠিত রূপ ফিরে আসে ১৯১০ সাল নাগাদ। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যাও তখন বেড়ে হয়েছে প্রায় ১০০; এর আগে ১৯০৪/০৫ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫/২০ জনের মতো।[৩৭]

স্বদেশী প্রচারে যোগ দিতে না পারলেও ছাত্ররা রবীন্দ্রনাথের রচিত স্বদেশী গান গেয়ে এবং ভুবনডাঙা গ্রামে দরিদ্র শিশুদের পড়িয়ে আর ওষুধ বিতরণ করে একরকম সমাজসেবার কাজ করে যাচ্ছিল। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অবশ্য গড়ে ওঠেনি।[৩৮]

বয়কট আর পিকেটিং-সর্বস্ব স্বদেশী আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করেননি। বোমার রাজনীতিও তাঁর সমর্থন পায়নি। আন্দোলনের উত্তাল পর্বে পূর্ববঙ্গের জমিদারিতে গ্রাম-পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এইসময় তাঁর আত্মশক্তির তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। গ্রামের লোকে যাতে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে-তার জন্যে গ্রামবাসীদের দিয়ে রাস্তা তৈরি, পুকুর কাটানো, জঙ্গল-পরিষ্কার ইত্যাদির কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পল্লিসমাজ পরিচালনার জন্য বিরাহিমপুর পরগনাকে (শিলাইদহ) কয়েকটি মণ্ডলীতে ভাগ করে প্রতিটি মণ্ডলীর জন্য একজন করে অধ্যক্ষ নির্বাচন করে দেওয়া হয়। গ্রামের যুবকদের নিয়ে গঠন করা হয় 'ব্রতীবালক' সংগঠন। এছাড়া গ্রামবাসীদের চাঁদা দিয়ে স্ব-উদ্যোগে তহবিল গঠন, অবৈতনিক পাঠশালা এবং মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং পতিসরে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের আয়োজনও এইসময় শুরু হয়। এর আগে শিলাইদহে তাঁত বসিয়ে কৃষকদের জন্য একটা বিকল্প জীবিকার কথা চিন্তা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই পর্বে তিনি আলু, পেঁয়াজ, চিনাবাদাম, মটরশুঁটি ইত্যাদির চাষ শুরু করলেন কুঠিবাড়ির বাগানে। তাঁতশিল্পের প্রশিক্ষণ দিতে এলেন একজন স্থানীয় কারুশিল্পী-ভগবান তাঁতি। অভাবের সময় গ্রামের সকলে যাতে সাহায্য পায়, তার জন্য ধর্মগোলা স্থাপনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।[৩৯]

পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করেও রবীন্দ্রনাথ অবশ্য খুব সফল হতে পারেননি। সমবায় এবং পাটের ব্যবসা একেবারেই জমেনি। কৃষিব্যাঙ্ক অবশ্য চলেছিল এবং ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকা ওই ব্যাঙ্কেই গচ্ছিত রাখা হয়েছিল

বলে রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। বাস্তবে সফল না হলেও এই কর্মোদ্যোগের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি গভীর, স্থায়ী প্রভাব রেখে গিয়েছিল দেখা যায়; পরে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি এই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেছেন এবং বছরদশেক পরে তাঁর সেই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা আরও বড়ো এবং সুগঠিত আকারে দেখা গেল শ্রীনিকেতনে। কিন্তু তারও আগে ১৯১০ সাল নাগাদ শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তিনি বিশেষভাবে জোর দিলেন প্রতিবেশী গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের ওপর। গ্রামের সঙ্গে বিদ্যালয়ের কোনো যোগই আগে ছিল না, তা নয়। তবে সেই সম্পর্ক খুব নিবিড় হতে পারেনি। অমিতা সেন লিখেছেন, সাঁওতালরা ছাত্রীদের 'কাঁচবাংলার দিদি' বলেই জানত। জঙ্গল পরিষ্কারের মতো সমাজসেবার কাজেও ছাত্রদের নিয়োগ করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রদের দিক থেকে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি।[৪০]

দ্বিতীয় পর্বে দেখতে পাব, পল্লী-উন্নয়নের কাজকে রবীন্দ্রনাথ একেবারে শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ করে নিতে চাইছেন। ঠিক এই সময় (১৯০৯) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ফিরলেন বিদেশ থেকে কৃষিবিদ্যার পাঠ নিয়ে। রথীন্দ্রনাথকে প্রথমে পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে খামার গড়ে তোলা এবং কৃষি-গবেষণার ভার নিতে হয়েছিল। আমেরিকা থেকে ভুট্টা এবং আরও কিছু বীজ নিয়ে এসে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেছিলেন তিনি; এলাকার ভূমির উপযোগী লাঙল এবং কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতিও তৈরি করা হয়েছিল।[৪১] কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পিতার আহ্বানে তাঁকে শান্তিনিকেতনে চলে আসতে হলো।

সুরুলের কুঠিবাড়িটি তার আগেই কেনা হয়ে গেছে। রথীন্দ্রনাথ এবং সন্তোষচন্দ্র এবার সেখানে কাজ শুরু করলেন। একটা গোশালা স্থাপন করা হলো। গ্রামাবাসীদের সংগঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু অর্থাভাবে এবং সাংগঠনিক কারণে কাজ খুব বেশি দূর এগোয়নি। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রথীন্দ্রনাথ-কে সুরুল ছেড়ে চলে আসতে হয়। প্রয়াসটি একরকম ব্যর্থ হলেও বছরদশেক পরে শ্রীনিকেতন কর্ম-পরিকল্পনায় এই অভিজ্ঞতা নানাভাবে সাহায্য করেছিল। রথীন্দ্রনাথ সুরুলে বিকল্প জীবিকা হিসাবে কুটিরশিল্প এবং সমবায়-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথাও ভেবেছিলেন।[৪২]

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রথমদিকে কোনো সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম ছিল না। রবীন্দ্রনাথের

'শিশু' কাব্যগ্রন্থ, উপেন্দ্রকিশোর-রচিত শিশুপাঠ্য রামায়ণ-মহাভারত—এইগুলিই পড়ানো হতো। তবে ছাত্ররা আরও অনেক কিছুই শিখত শিক্ষকদের মুখ থেকে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ইংরেজি কবিতা শোনাতেন এবং নানারকম গল্প বলতেন। এছাড়া বাঙলা এবং সংস্কৃত তিনি পড়াতেন। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ও সহজ করে শোনানো হতো। ক্ষিতিমোহন সেন এবং নেপালচন্দ্র রায়ের গল্প-বলার কথাও উল্লেখ করেছেন প্রমথনাথ বিশী। বাঙলা পড়াতেন তেজেশচন্দ্র সেন; গণিত—জগদানন্দ রায়। তেজেশচন্দ্র এবং নেপালচন্দ্র রায় ইংরেজিও পড়াতেন বলে জানিয়েছেন কালীপদ রায়।

শান্তিনিকেতনে তখন ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত অর্থে শ্রেণিবিভাগ বলে কিছু ছিল না। সামর্থ্য-অনুসারে একই ছাত্র এক-একটি বিষয় উচ্চতর বা নিম্নতর শ্রেণীতে পড়তে পারত; যেমন একই ছাত্র বাঙলা-ইংরেজিতে হয়তো সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে, কিন্তু গণিতে সে অষ্টম শ্রেণীভুক্ত।[৪৩] এই সামর্থ্য-অনুসারী বিভাজন নিঃসন্দেহে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত এবং ছাত্রদের পক্ষে সুবিধাজনক। স্থিরনির্দিষ্ট কোনো পাঠক্রম না থাকার ফলেই এরকম একটি মুক্ত পরিসর সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্বে দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ কিছু পাঠ্যবই রচনার প্রয়োজন বোধ করছেন। সংস্কৃতশিক্ষার একটি ভূমিকা তিনি নিজে আগেই রচনা করেছিলেন। পরে হরিচরণ বন্দ্যোপাধায়কে উৎসাহ দিয়ে লিখিয়ে নেন : সংস্কৃত-প্রবেশ। উপক্রমণিকার ওপর গুরুত্ব না দিয়েও সংস্কৃতশিক্ষা সম্ভব বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। ইংরেজি-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল, ছাত্রদের প্রথমে 'বাক্যবিন্যাসের সাধারণ নিয়মগুলি' আয়ত্ত করতে হবে এবং গঠনে বিশেষ জটিলতা নেই—এমন বাক্যরচনাপ্রণালীই আগে শিখতে হবে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, ছাত্রদের বেশ কিছুটা টানা ইংরেজি শোনার সুযোগ করে দিতে হবে। প্রতিটি শব্দের অর্থ হয়তো তারা বুঝবে না; কিন্তু এর দ্বারা ভাষার সঙ্গে তাদের একটা নিকট-পরিচয় গড়ে উঠবে।[৪৪]

ভাষাশিক্ষার আধুনিক পদ্ধতির নিরিখে দেখলে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাকে রীতিমতো প্রাগ্রসর বলতে হয়। তিনি ইংরেজি শেখাতেন এইভাবে : মাঠে একটা পাথর পড়ে আছে; তিনি আঙুল দেখিয়ে বললেন : 'ফেচ দ্য স্টোন'। ছাত্ররা

ইঙ্গিতে তাঁর নির্দেশ বুঝে নিল এবং কাজটি সম্পন্ন করার ভেতর দিয়ে 'ফেচ' আর 'স্টোন' শব্দদুটির অর্থ জেনে গেল।[৪৫] এখনকার ভাষায় যাকে 'কমিউনিকেটিভ' পদ্ধতি বলা হচ্ছে, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার একটা স্পষ্ট মিল লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ শব্দ ধরে-ধরে নয়, গোটা একটা বাক্য দিয়েই শুরু করতে চাইতেন। এই বিষয়ে বিশদ বর্ণনা আছে কালীপদ রায়ের গ্রন্থে (পৃ ২২-২৬)।

১৯০৯ সালে তিনি নিজেই একটি পাঠ্যবই রচনা করেন : 'ইংরেজি সোপান'।[৪৬] এই পুস্তকে অনুসৃত পদ্ধতি কিন্তু ছিল অনেকটাই গতানুগতিক। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত অনুবাদ-পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলেন, এবং ইংরেজি শেখাতে চেয়েছিলেন বাঙলার সাহায্যে। প্রসঙ্গত মনে রাখা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার একজন প্রধান প্রবক্তা; কিন্তু প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেননি। সেই ১৮৯৩ সালেই তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল: 'বাল্যকাল হইতেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক, কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিকরূপে অতি অল্পে অল্পে।'[৪৭] ১৯১৭ সালে শিক্ষা কমিশনের সভাপতি মাইকেল স্যাডলারের কাছেও তিনি সেই অভিমতই ব্যক্ত করেন : শিক্ষাগ্রহণ হবে 'মাতৃভাষার আধারে', কিন্তু ইংরেজিকেও 'খুব ভালো করে শেখাতে হবে।'[৪৮]

ইংরেজিশিক্ষার পদ্ধতি নিয়েও রবীন্দ্রনাথের কিছু মৌলিক ভাবনা ছিল। ১৮৯৩ সালের নিবন্ধটিতেই বলেছিলেন, ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি মাতৃভাষায় পড়িয়ে ইংরেজিকে কেবল ভাষা হিসাবে শেখানো হোক; সেক্ষেত্রে 'বাংলা শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষায় সাহায্য করিবে।' রথীন্দ্রনাথকেও তিনি সেইভাবেই পড়িয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে জগদানন্দ রায়কে একটি চিঠিতে বলেন, পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি আর সংস্কৃত কিছু সাহিত্যগ্রন্থ 'একেবারে হু হু করে ছেলেদের পড়িয়ে' দেওয়া দরকার। এর ফলে সব শব্দের অর্থ না বুঝলেও 'ভাষার পরিচয়টা মনের ভিতরে ভিতরে গড়ে উঠতে থাকে।'[৪৯] ইংরেজি গল্প-কবিতা শোনানো, এমনকী ছাত্রদের দিয়ে ইংরেজি নাটক অভিনয় করানোরও মাঝেমাঝে প্রয়োজন আছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন।[৫০] বেশ বোঝা যায়, ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই শুধু ব্যাকরণের একটি তন্ত্র হিসাবে দেখেননি।

ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর এই দীপ্র ভাবনার পরিচয় আরও স্পষ্ট করে পাওয়া

যায়, বাঙলাশিক্ষা বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের ভেতরে। জীবনস্মৃতি-তে বলেছিলেন, ভাষা শেখার অর্থ শুধু বুঝিয়ে দেওয়া নয় 'মনের মধ্যে ঘা দেওয়া';[৫১] আর ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভাষণে মনে করিয়ে দিলেন, আমরা ভাষা শিখি 'ভাষাতত্ত্ব দিয়ে নয়—রচনায় ভাষার ব্যবহার দিয়ে।'[৫২]

ভাষাবিজ্ঞানে যাকে বলে 'ল্যাংগুয়েজ ইন কনটেক্সট', তার কথাই বলছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৩ সালের পত্রটিতে খুব সহজ করেও হলেও যেন একটি তত্ত্বেরই আভাস দিয়েছেন, সে-তত্ত্বের ভিতর নোয়ম চমস্কির দু-একটি সূত্রের যেন পূর্বাভাস পাই। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, ভাষার নিরন্তর প্রবাহ শিশুর মনের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আর সেই প্রবাহ 'অন্তরের মধ্যে পলি রেখে যাচ্ছে'; এটা ঘটছে, আমাদের 'অগোচরে, অলক্ষ্যে'— কখন যে 'শিক্ষা সম্পন্ন হয়ে যায়, তা টেরই পাওয়া যায় না।' চমস্কিও বলবেন : ব্যাপারটা এইভাবেই 'ঘটে'—'মানুষের মন এইভাবেই চলে'।[৫৩]

ভাষাশিক্ষার কোনো সুনির্দিষ্ট স্তরবিন্যাস আছে বলেও রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন না। তাঁর মতে, শিশুরা 'মাতৃভাষা একটু করে বাঁধ বেঁধে বেঁধে পাকা করে শেখে না—তারা যা জেনেছে এবং যা জানে না সমস্তই তাদের মনের উপরে অবিশ্রাম বর্ষণ হোতে থাকে।' সুতরাং শিশু 'যেটুকু পড়বে সেটুকু সম্পূর্ণ পাকা করে পড়ে তারপরে এগোতে দেওয়ার যে প্রণালী আছে, সেটা স্বভাবের প্রণালী নয়।' (জগদানন্দকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠি)

রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার মধ্যে আধুনিক ভাষাশিক্ষাচিন্তার কয়েকটি মূলসূত্র একেবারে অনুলিপ্ত হয়ে আছে। ভাষাশিক্ষাটা কোনো একরেখ (লিনিয়ার), একমুখী প্রক্রিয়া নয়। সহজ রীতিনীতি শিশুরা আগে শেখে, এমন কথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। ভাষা নিছক একটা অভ্যাস-প্রণালী (হ্যাবিট সিস্টেম) নয়; ভাষার একটা ধারণা, একটা 'অন্তর্জাত মননশক্তি'—চমস্কি যাকে বলেন 'ইনেট ফ্যাকাল্টি'—শিশুর মনের ভেতরেই থাকে। ভাষা শেখার মানে কেবল শব্দের অর্থ আর বানান মুখস্থ করা নয়—শব্দকে ঠিক জায়গামতো বসিয়ে নতুন অর্থ নির্মাণ করতে শেখা; হ্যালিডের ভাষায় : সিগনিফিকেশন।[৫৪]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুক্রমে বাঙলায় ভাষাশিক্ষার যে-প্রণালী জনপ্রিয়

হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা তার থেকে স্পষ্টত পৃথক। বিদ্যাসাগর শব্দের অর্থের ওপর একেবারেই গুরুত্ব দেননি। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগে তাঁর নির্দেশ ছিল : শুধু 'বর্ণবিভাগ' অর্থাৎ বানান শেখালেই চলবে। যে-ধরনের শব্দ তিনি তাঁর পুস্তকে নির্বাচন করেছিলেন, তার সঙ্গে শিশুর পরিচিত এবং পরিজ্ঞাত জগতের সম্পর্ক প্রায় নেই। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একটা অর্থময়,অনুভূতিময় প্রক্রিয়ার কথা বলছেন। দ্বিতীয়ত, ভাষার ব্যাকরণগত রীতিনীতি শেখার আগে শুনে-শুনে তার ধাতটা বুঝে নেওয়ার ওপরও তিনি জোর দিচ্ছেন। এই তত্ত্ব আজকের বিচারেও খুবই অগ্রগামী; কারণ ভাষাশিক্ষার নামে নিরর্থ শব্দচিহ্ন আর বানান মুখস্থ করে যাওয়ার রীতিই এখনও বেশি প্রচলিত; বানান-পদ্ধতির দাপট সারা পৃথিবীতেই আজও বেশ প্রবল।

তবে বাঙলাশিক্ষা ইংরেজিশিক্ষায় সাহায্য করবে, রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা তর্কসাপেক্ষ। প্রতিটি ভাষারই একটি বিশিষ্ট প্রচল, একটি নিজস্ব পদগঠনরীতি আছে। একটি ভাষার রীতি আগে আয়ত্ত করে নিলে, তার সাহায্যে দ্বিতীয় ভাষার রীতিটি রপ্ত করা সহজ হবে, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না; বিষয়টি নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীমহলে আজও মতপার্থক্য রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে প্রচলিত অনুবাদ-পদ্ধতির সাহায্যেই ইংরেজি শেখাতে চেয়েছিলেন; সেক্ষেত্রে তাঁর বইতে অন্তত তিনি নতুন কোনো দৃকচেতনার পরিচয় দিতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, অনুবাদের জন্য যে-ধরনের বাক্য তিনি সন্নিবিষ্ট করেছিলেন, তা খুবই কৃত্রিম এবং অনেক সময় প্রায় অর্থহীন বলা যায়। 'খারাপ লাল কালী', 'বৃদ্ধ মোটা গাধা', 'পাতলা মানুষটির একটি উঁচু বড় নাক আছে'[৫৫]—এই ধরনের কথা আমরা কখনো শুনি না, বলিও না। এগুলি অনুবাদের ভিতর দিয়ে ভাষা শেখা যাবে, এই ধারণা খুব যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয় না।

প্রতিটি ইংরেজি বিশেষ্যকে 'দি' আর্টিক্লসমেত শিখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশও সমর্থনীয় নয়। 'ইংক' বা 'বেড' শব্দ অনেক সময়ই 'দি' ছাড়া ব্যবহার হয়। সুতরাং ইংরেজি সোপানে যেভাবে দেওয়া আছে—যেমন : দি ইংক—কালী । দ্য বেড—বিছানা—এইভাবে মুখস্থ করালে ছাত্রদের কার্যত ভুল ব্যবহারের দিকেই প্রণোদিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ রচনার ভেতর ভাষার ব্যবহারের রূপটি বোঝার কথা বলেছিলেন, সেই চিন্তার অনুসৃতি তাঁর ইংরেজি

পাঠ্যপুস্তকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি নিজে যেভাবে কথালাপের ভেতর দিয়ে শেখাতেন, তার সঙ্গেও পুস্তকের পদ্ধতিটি মেলে না।

এর চেয়ে অনেক বেশি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাই বরং তাঁর দৃষ্টিচর্চা বা 'সেন্স ট্রেনিং' পদ্ধতিতে। 'মনের চেষ্টায় সত্য আহরণের স্বাভাবিক ক্ষমতা' শিশুর থাকে, এটা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন।[৫৬] শিক্ষাপদ্ধতিতে তাই তিনি 'স্বভাবের প্রণালী' বা 'প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞানলাভের' প্রক্রিয়ার ওপর বারবার জোর দিয়েছেন। শিশুরা যাতে তাদের সহজাত অনুমানশক্তির সাহায্যে একটা ধারণা গড়ে নিতে পারে, তার কথা মনে রেখেই তিনি কয়েকটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। যেমন প্রথমে একটি এক-ফুটের স্কেল দেখিয়ে তার দৈর্ঘ্যটার একটা ধারণা ছাত্রদের দেওয়া হলো। তারপর বিভিন্ন আকার-আয়তনের বস্তু দেখিয়ে তাদের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আন্দাজ করতে বলা হলো। সব শেষে প্রত্যেকের হাতে স্কেলটি দিয়ে বলা হলো, সে এবার মেপে দেখুক—প্রকৃত দৈর্ঘ্য বা প্রস্থের সঙ্গে তার অনুমিত ধারণা কতটা মিলেছে। 'যার আন্দাজটা আসল মাপের সবচেয়ে কাছাকাছি হতো, তারই জিৎ হতো'।[৫৭] এইভাবে বিভিন্ন বস্তুর ওজন নিয়েও অনুমানশক্তির পরীক্ষার খেলা চলত।[৫৮] ১৯৩৫ সালে পদ্ধতিটি নিয়ে একটি পুস্তিকাও তৈরি করা হয়েছিল।[৫৯] রবীন্দ্রনাথ স্বভাবের প্রণালীতে বিশ্বাস করতেন, আমরা শুনেছি। শিশুর শরীর আর মনের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক বিকাশ কীভাবে হতে পারে, সে-বিষয়ে তার নিজস্ব কিছু মত-ও ছিল। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের গ্রহণশক্তিরও তারতম্য ঘটে কিনা, তাই নিয়েও তিনি ভাবনাচিন্তা করেছিলেন।[৬০] জার্মান শিক্ষাবিদ রুডলফ স্টাইনারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার একটা মিল এখানে লক্ষ করা যায়।

সমকালীন বা পরবর্তী যুগের কোনো-কোনো শিক্ষাবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা মাঝে মাঝে এসে যাচ্ছে। এর দ্বারা আমরা বলতে চাইছি না যে, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের সবকিছুই রবীন্দ্রনাথ আগে অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিংবা তাঁর কোনো-কোনো ভাবনার অনুবৃত্তি উত্তরকালীন শিক্ষাচিন্তায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বলেই তাদের গুরুত্ব বেড়ে গেল। আমাদের বলার কথা এই যে, শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবতে শুরু করেছিলেন প্রায় যৌবনকাল থেকেই; ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি তাঁর মতো করে অনেকেই দেখাতে পারেননি। তবে

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে এবং তার কিছুকাল পরেও বিকল্প-শিক্ষার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্প তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না। কিন্তু নানা ভাবনার প্রভাবে এবং কাজ করতে-করতে নানারকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তাঁর শিক্ষাচিন্তা একটি সংহত রূপ পাচ্ছে, বিকল্প শিক্ষা-প্রণালীর একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, দেখা যায়।

প্রায় প্রতিটি পাঠ্যবিষয় নিয়েই রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করছেন। যেমন ইতিহাস-শিক্ষা নিয়ে ভাবতে গিয়ে তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান ঘটনাগুলি নিয়ে একটি সারণি (অ্যানালিটিক্যাল টেব্‌ল) তৈরি করে নিতে পারলে খুব সুবিধে হয়। বিষয়টি নিয়ে অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের সঙ্গে তাঁর মতালাপও হয়েছিল। এর আগে ১৯১০ সাল নাগাদ ভারত-ইতিহাসের ওপর 'স্লাইড সহযোগে' একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন যদুনাথ।[৬১] ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ছায়াচিত্র মাঝে মাঝেই দেখানো হতো। আমন্ত্রিত অতিথিরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দিতেন। ১৯২০ সালে যৌনশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিদ জাহাঙ্গীর তারাপুরওয়ালা।[৬২] (দ্র.পরিশিষ্ট : ১, ৩)

নেপালচন্দ্র রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং পিয়রসনের মতো শিক্ষকেরা মিলে শান্তিনিকেতন-শিক্ষাধারায় একটা নতুনত্ব নিয়ে আসেন, এবং কিছু অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তন করেন বলা যায়। নেপালচন্দ্র ভূগোলের ক্লাস নিতেন ছেলেদের নিয়ে মাঠেঘাটে, ছাত্ররা শিক্ষকের সঙ্গে হেঁটে কোপাই নদীর উৎস খুঁজে বের করেছিল। ১৯২২ সালে তিনি 'ভূ-পরিচয়' নামে একটি পাঠ্যবই রচনা করেন। প্রভাতচন্দ্র ভূগোলের বিষয়গুলি গল্পের মতো করে বলতেন। ছাত্রদের তিনি খোয়াই দেখিয়ে মালভূমি, 'মৃত্তিকার নানাপ্রকার ভেদ' ইত্যাদি বোঝাতেন। ছাত্ররা লিখে নিত। পরে শিক্ষক সংশোধন করে দিলে তাদের সেই রচনাগুলিই হয়ে যেত পাঠ্যবিষয় বা টেক্সট। পিয়রসনের ক্লাসে 'কোন বই লাগত না। ..... গাছ-লতা, ফল-ফুল, প্রজাপতি –পাখি এইসবই ছিল আমাদের বই', লিখছেন অমিতা সেন। ঘরে গুটিপোকা রেখে প্রজাপতির ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াটি ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ করতে বলতেন পিয়রসন।[৬৩] তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি শিশুকে তার মানস-প্রবণতা অনুযায়ী বিকশিত হবার সুযোগ দেওয়া উচিত।[৬৪]

বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়েদের যুযুৎসু শেখাতে আসতেন তাকাগাকি নামে এক জাপানি শিক্ষক। পরে প্রাক্তন অনুশীলন-বিপ্লবী পুলিন দাস-ও কিছুদিন প্রশিক্ষকের কাজ করেন। মেয়েরা সেলাই শিখত কালীমোহন ঘোষের আত্মীয়া সুকুমারী দেবীর কাছে। ছোটো মেয়েদের ছেঁড়া জামাগুলি মেরামত করার ভেতর দিয়েই তাদের সুচিশিক্ষার পাঠ সম্পন্ন হতো।[৬৫] হাতের কাজ শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমে কোনো সম্পূরক বিষয় হিসাবে সংযুক্ত ছিল না। শেখা চলত কাজ করতে-করতেই। ছাত্রছাত্রীদের লেখা নিয়ে 'শান্তি' নামের একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হতো। প্রথমদিকে কোনো শ্রেণিবিভাগ না থাকলেও পরে আদ্য-মধ্য-শিশু এই তিনটি ভাগ করা হয়। পরীক্ষার বদলে মাসিক মূল্যায়নরীতিই প্রচলিত ছিল।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ

প্রচলিত বিদ্যালয়কে রবীন্দ্রনাথ কারাগারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং শিক্ষার নামে কঠিন শাস্তি বা পীড়নের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ১৯০৬ সালের একটি রচনায় তাঁর আহ্বান ছিল : 'প্রাচীর ভাঙিয়া ফেল; মাতৃগর্ভের দশমাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিয়ো না।' ১৯১৬ সালে ওটেন সাহেবকে নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে হাঙ্গামার পর লেখেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস: ছাত্ররা 'ঠিক পথেই চলিবে যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়।'[৬৫ক] শিশুর আত্মসম্মানবোধকে মর্যাদা দেওয়ার কথা রবীন্দ্রনাথ বারবারই বলেছেন। ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি নিয়ে আলোচনার সময় আজও আমরা এইদিকটা বিশেষ মনে রাখি না।

ছাত্রদের মধ্যে স্বশাসনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে প্রতি শ্রেণীর জন্য কাপ্তেন-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তবে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, ছাত্ররা যেমন কাপ্তেনকে অমান্য করার চেষ্টা করত: কাপ্তেনরাও অনেক সময় পরোক্ষে নিয়মভঙ্গে প্রশ্রয় দিত। বিদ্যালয়ে শান্তিশৃঙ্খলার সমস্যা মাঝে মাঝেই দেখা গেছে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র মানেই সুবোধ, সুশীল হতো না। জগদানন্দ কখনো-কখনো রাগের বশে বলতেন : 'বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো' ছেলে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সম্পর্কে ওইরকম উক্তি তখন অনেকের মুখেই শোনা

যেত। নিয়মভাঙার প্রবণতা ছাত্রদের ভেতর বেশ ভালো করেই ছিল। ছাত্ররা মারধোরও খেত মাঝে মাঝে। রথীন্দ্রনাথ এবং প্রমথনাথ কয়েকটি সরস ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। জগদানন্দ রায়ের চপেটাঘাত নিয়ে ছড়া পর্যন্ত লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রায় কোনো আড়ম্বর ছিলনা; আহার্য অতি সাধারণ। প্রমথনাথ বিশীর লেখায় দেখি, ছাত্ররা পুরনো কাপড়ের বিনিময়ে সাঁওতালদের কাছ থেকে ডিম কিনে অমলেট ভেজে খাওয়ার দুঃসাহসও দেখাতে পারত। নন্দলাল বসু এলম্‌হার্স্ট-কে বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের ছেলেরাই হলো 'সবচেয়ে বড়ো উৎপাত'।[৬৬]

আরও গভীর আকারের সমস্যাও রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে ব্যথিত করেছে। ছাত্রীদের পোশাকে শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এই অভিযোগ তাঁকে শুনতে হয়েছিল।[৬৭] দীনেশচন্দ্র সেনের মতো অভিভাবকও তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। একবার একটি ছাত্রকে কায়িক শাস্তি দেওয়া নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, এমন শিক্ষক আশ্রমে না থাকাই ভালো। ছাত্রদের তিনি তিরস্কার বলে বলেন : 'তোরা কি মনে করেছিস তোদের (এই) বিশ্রী আচরণকেও সহ্য করব?'[৬৮] আর-একবার জনৈক শিক্ষক এক ছাত্রকে তিরস্কার করলে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রটির পক্ষ নিয়ে ওই শিক্ষককে দু-একটি কটু কথা শুনিয়ে দেন। ফলে বিদ্যালয়ে অশান্তি ঘনিয়ে ওঠে।[৬৯] এইরকম নানা অপ্রীতিকর ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠতেন এবং তাঁর অসন্তোষ গোপন থাকত না।

শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্কও মতান্তর বা মনান্তর থেকে মুক্ত ছিল না। 'আর কোনোখানে'-তে লীলা মজুমদার যে-পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন, তাকে খুব প্রীতিপূর্ণ বলা যায় না। শিক্ষকদের সকলেই একইরকম আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন না। গান্ধিজীর প্রথম শান্তিনিকেতন-দর্শনের কাহিনিটি সুপরিচিত। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে শান্তিনিকেতনে এসে গান্ধিজী শিক্ষকদের অনুরোধ করেছিলেন, তারা যেন পাচককে ছুটি দিয়ে নিজেরাই ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে রান্নার কাজটি করেন।[৭০] নেপালচন্দ্র রায়, পিয়রসন এবং আরও দু-একজন খুবই আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ছাত্ররাও সোৎসাহে রান্নার কাজে লেগে যায়। কিন্তু কয়েকজন শিক্ষকের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় অনুপস্থিত ছিলেন। ফিরে এসে সব শুনে তিনি বাধা দেননি। আবার খুব উৎসাহও দেখাননি। রান্নার হুজুগে ছাত্রদের লেখাপড়ার ক্ষতি হোক, এটা তিনি চাননি। ক্ষতি যে হচ্ছিল, তা প্রমথনাথ বিশীও স্বীকার করেছেন।[৭১]

আর-একবার শিক্ষকরা কয়েকজন মিলে ঠিক করেছিলেন, এক শূদ্রকে দিয়ে রান্নার কাজ করানো হবে। বিধুশেখর শাস্ত্রী রাজি হননি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অস্পৃশ্য জাতির' এক বালকের স্পর্শে অন্নব্যঞ্জন একদিন 'দূষিত' হয়ে যাওয়ায়, তা আর খাওয়া হয়নি।[৭২] মুসলমান ছাত্রগ্রহণে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু কোনো-কোনো শিক্ষকের আপত্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন : 'আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা পর্যন্ত চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কি অপরাধ করিল?'[৭৩] অনেক পরে ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে প্রথম মুসলমান ছাত্র এলেন : সৈয়দ মুজতবা আলী।

১৯০৫ সালে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'-এ রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন, আমরা নৃতত্ত্বের বই পড়ি, কিন্তু ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম-বাগদি-কৈবর্তরা রয়েছে তাদের সম্পর্কে আমাদের 'লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না।' এই ঔৎসুক্য জাগানোর চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গ্রামের পরিচয় করিয়ে দিয়ে, পল্লি- সেবার আদর্শে তাদের প্রাণিত করে। কালীমোহন ঘোষ মাঝে মাঝে ছাত্রদের ভুবনডাঙা এবং সুরুল গ্রামে নিয়ে যেতেন; কিন্তু ১৯১৯-২০ সালের আগে গ্রামের সঙ্গে বিদ্যালয়ের তেমন কোনো নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ওই সময় থেকেই দেখি, পৌষমেলায় স্বাস্থ্যচেতনার প্রদর্শনী হচ্ছে, কেঁদুলির মেলায় ম্যালেরিয়া এবং বসন্তরোগ নিয়ে স্লাইড প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন কালীমোহন। বরদাকান্ত চক্রবর্তী নামে এক চিকিৎসক মাঝে-মাঝে হাটের দিনে ওষুধ এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে অস্থায়ী ক্লিনিক সাজিয়ে বসছেন; ছাত্ররা জলসত্র স্থাপন করছে, ইত্যাদি। আশ্রম-পত্রিকায় পড়ি : 'আশ্রমের রাস্তাগুলির সংস্কার হইতেছে। ছেলেরা অপরাহ্ণে খেলার সময় ঐ কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছে।[৭৪] (দ্র.পরিশিষ্ট : ২)

১৯১৯ সালের পৌষমেলায় একটি অত্যন্ত তাৎপর্যময় ঘটনা ঘটে। বীরভূমের জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত মেলায় পল্লিজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা

করার পর 'কতিপয় কৃষক (তাঁর সঙ্গে) এ বিষয়ে মন খুলিয়া আলাপ করে'।[৭৫] এরকম অন্তরালাপের কথা আমরা আজও ভাবতে পারি না। পৌষমেলার অনুষ্ঠানটি ক্রমেই গ্রামের লোকেদের একটি উৎসব হয়ে উঠছে, দেখতে পাই। শান্তিনিকেতনও আর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হয়ে নেই। আশ্রমের সংলগ্ন সাঁওতাল গ্রামে পিয়রসন 'সুহৃদ বিদ্যালয়' নামে একটি নৈশ বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। পরে 'ভুবনডাঙা গ্রামেও আর-একটি স্কুল তৈরি হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে : 'প্রসাদ বিদ্যালয়'। পিয়রসন ছাত্রদের নিয়ে স্কুলগুলিতে যাচ্ছেন, স্বেচ্ছাব্রতী ছাত্ররা গ্রামবাসীদের পড়াচ্ছে, আশ্রম-পত্রিকায় তার উল্লেখ পাই।[৭৬]

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এইসময় বিদ্যালয়ের জন্য অনেক সময় দিচ্ছিলেন। ১৯১৮-র অগস্টে রানু অধিকারীকে লিখছেন, তিনি প্রতিদিন সকালে ছেলেদের পড়ান এবং সন্ধ্যায় 'পরদিনের পাঠ' তৈরি করে রাখেন। ছেলেরা তাঁর ক্লাসটাকে খেলা মনে করে, আর তাঁকে তাদের 'খেলার সঙ্গী' ভাবে। সৈয়দ মুজতবা আলীও মনে করতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' পড়ানোর আগে নোট তৈরি করে নিয়ে আসতেন।[৭৭] কিন্তু ঠিক ওই সময়েই আবার ভিতর থেকে আসা কতকগুলি কারণে বিদ্যালয়টি রবীন্দ্রনাথের আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। অভিভাবকদের চাপে এবং বাস্তব প্রয়োজনের কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম গ্রহণ করতে হলো (১৯১৮)। এর আগে শেষ দু-বছর শুধু ম্যাট্রিকুলেশন পাঠক্রম অনুসারে পড়ানো হতো এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে ছাত্ররা জেলা স্কুল থেকে পরীক্ষা দিত।[৭৮] রথীন্দ্রনাথ সেইভাবেই পড়াশোনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতেও একটি পরিবর্তন আসছিল। মহৎভাব, বিশ্বপ্রকৃতির সাহচর্য ইত্যাদি যে-আদর্শগুলি নিয়ে তিনি বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন, সেগুলি আমাদের দেশে নতুন; তবে রুশোর পর থেকে ইয়োরোপের শিক্ষাভাবনায় এই তত্ত্ব আগেই এসে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যেন এবার তাঁর নিজের তৈরি প্রতিষ্ঠানকেই একটা ভিন্ন আদর্শের দিকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। ১৯১৭ সালে কলকাতায় একটি ভাষণে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'যে রাজস্ব হইতে আমাদের উন্নত শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার বেশির ভাগ অর্থ আমাদের ঐ অশিক্ষিত কৃষকেরাই যোগাইতেছে'; তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য'। (*প্রবাসী,* কার্তিক, ১৩২৪) বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার সময়

(১৯১৯) তাঁর চিন্তার এই দিগন্ত আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হলো: 'যেখানে চাষ হইতেছে কলুর ঘানি ও কুমোরের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোন স্পর্শও পৌঁছায় নাই।'[৭৯] এর দু-বছর পরেই আমেরিকায় এলম্‌হার্স্টকে জানাবেন তাঁর নতুন বাসনার কথা; গ্রামগুলো মুমূর্ষ, শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। তিনি এমন একটা শিক্ষার কথা ভাবছেন যার শক্তিতে গ্রামের কৃষকেরা স্ব-উদ্যোগে মৃত গ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে।[৮০]

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এমন-একটি বিদ্যালয়, যা 'সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে' পল্লিজীবনে প্রয়োগ করে 'দেশের জীবনযাত্রায় কেন্দ্রস্থান' অধিকার করবে। কিন্তু তিনি বোধহয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, বিশ্বভারতীকে দিয়ে এ-কাজ হবার নয়। তাই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই গড়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারার আর-একটি অভিনব প্রয়োগক্ষেত্র : শ্রীনিকেতন (১৯২২)। নতুন একটি বিদ্যালয় : 'শিক্ষাসত্র' (১৯২৪)।

উল্লেখপঞ্জি

১. *শিক্ষার হেরফের,* দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *'সংকলন'*।

২. *ছিন্নপত্রাবলী,* ১৬৩ নং পত্র।

৩. *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : শিক্ষাচিন্তা;* সম্পাদনা : সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পৃ.৭৭।

৪. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী* : ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

৫. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন,* পৃ. ৩৭।

৬. অমিতা সেন, *শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা,* পৃ.৫৭-৫৮।

৭. রবার্ট ইলিচ, *হিস্টরি অফ এডুকেশনাল থট,* ১৯৫০, পৃ. ২৮৫-৮৭।

৮. *'শিক্ষার মিলন'* দ্র. সংকলন।

৯. 'তপোবন' দ্র. *শিক্ষাচিন্তা,* পৃ.১১২-১৫।

১০. অজিতকুমার চক্রবর্তী, *ব্রহ্মবিদ্যালয়,* পৃ. ১০-১১; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-জীবনকথা,* পৃ. ৮৬।

১১. *'শিক্ষাচিন্তা',* পৃ. ১৩৬।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮, ১২১।

১৩. সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, *'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি',* দ্র বিশ্বনাথ দে-সম্পাদিত *রবীন্দ্রস্মৃতি,* পৃ. ১০২।

১৪. প্রমথনাথ বিশী, পৃ. ২১।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩৩।

১৬. প্রণতি মুখোপাধ্যায়, *শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম,* পৃ. ২০-২১।

১৬ক জগদানন্দ রায়, *স্মৃতি,* বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৬, পৃ. ৩১২।

১৭. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩, ৪৮।

১৮. সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি', দ্র. রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ. ২৭৩-৭৫।

১৯. *রবিজীবনী : ৬,* পৃ. ১৪২; *রবিজীবনী* : ৫, পৃ. ১২৭-২৮; প্রণতি মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৫।

২০. *রবিজীবনী : ৫,* পৃ. ৯৩, ১৪৮।

২১. প্রণতি মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭; *রবিজীবনী : ৫,* পৃ ৬৩, ৭৯।

২২. অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

২৩. *রবিজীবনী : ৫,* পৃ. ৭৯, ১১২; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী,* পৃ.৬১, ৬৩।

২৪. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি,* পৃ. ৬৩।

২৫. *রবিজীবনী : ৫,* পৃ. ১১৭-১১৮।

২৬. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *শান্তিনিকেতনের একযুগ,* পৃ. ৪৩।

২৭. সুধীরঞ্জন দাস, *আমাদের গুরুদেব,* পৃ. ২০-২১।

২৮. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত।

২৯. *রবিজীবনী : ৫,* পৃ. ১৩৪-৩৬।

৩০. প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৩-২৪, ১৩৯-৪০।

৩১. সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, *'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিকথা',* পৃ. ৮-৯।

৩২. অমিতা সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৩৩. সুধীরঞ্জন দাস, *আমাদের শান্তিনিকেতন,* পৃ. ৪১ : অমিতা সেন, পৃ. ৪৪।

৩৪. সুধীরঞ্জন দাস; *আমাদের গুরুদেব,* পৃ.২৪।

৩৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *'শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী',* পৃ.৪২।

৩৬. অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৩৭. *রবিজীবনী : ৬,* পৃ. ১৪১।

৩৮. অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৩৯. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ* পৃ. ৬৮-৭১, ৪১৯-২৪; রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

৪০. অমিতা সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০; প্রমথনাথ বিশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২, ৭৯।

৪১. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-৮।

৪২. এই তথ্য পাওয়া যায় রথীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে। দ্র. পুলিনবিহারী সেন-সম্পাদিত *রবীন্দ্রায়ণ,* পৃ ৩০২।

৪৩. প্রমথনাথ বিশী প্রাগুক্ত, পৃ. ১০; কালীপদ রায়, *'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ',* পৃ. ২৮-২৯।

৪৪. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ,* পৃ. ১৫০; *রবিজীবনী : ৫,* পৃ. ১৩৬, *শিক্ষচিন্তা,* পৃ. ১৪৯-৫০।

৪৫. সুধীরঞ্জন দাস, *আমাদের গুরুদেব,* পৃ. ২২।

৪৬. বইটির প্রথম অংশ 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা' আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা দেখেছি ৩য় সংস্করণ (১৩২০ ব)।

৪৭. *শিক্ষাচিন্তা,* পৃ. ৭৪।

৪৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-জীবনকথা,* পৃ. ১৫৪-৫৬।

৪৯. *শিক্ষাচিন্তা,* পৃ. ১৪৯-৫০।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩; কালীপদ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬।

৫১. *জীবনস্মৃতি,* পৃ. ৪১।

৫২. *শিক্ষাচিন্তা,* পৃ. ২৬০।

৫৩. নোয়ম চমস্কি, *ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড দ্য প্রবলেম্‌স অফ নলেজ,* পৃ. ২৫-২৬, ১৭১-৭৩।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৪, ১৯১; এম. এ. কে হ্যালিডে, *ল্যাংগুয়েজ অ্যাজ স্যোসাল সেমিওটিক,* পৃ. ১৬-১৭, ২০৫-১৪।

৫৫. *ইংরেজি সোপান* ৩য় সং, পৃ. ৭, ১৫।

৫৬. *শিক্ষাচিন্তা,* পৃ. ২১৭।

৫৭. সুধীরঞ্জন দাস, *আমাদের গুরুদেব,* পৃ. ২৪।

৫৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী,* পৃ. ৬৭-৬৮।

৫৯. *বিশ্বভারতী বুলেটিন* : ১৯/১৯৩৫।

৬০. সুধীরচন্দ্র কর, *শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা* পৃ. ৬।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩; *রবিজীবনী* : ৬, পৃ. ২০৯-১০।

৬২. *'শান্তিনিকেতন'* পত্রিকাসংকলন, সম্পাদনা : সুপ্তি মিত্র, পৃ. ৩৩।

৬৩. অমিতা সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১, ৪৬; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১১৪; কালীপদ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৬৪. পিয়রসন, *'শান্তিনিকেতন',* বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭০।

৬৫. অমিতা সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫, ৯০।

৬৫ক *শিক্ষাচিন্তা,* পৃ. ৯৪, ৯৮, ১৬৮-৬৯।

৬৬. এল. কে. এলম্‌হার্স্ট, *পোয়েট অ্যান্ড প্লাউম্যান,* পৃ. ১১৩; প্রমথনাথ বিশী, পৃ. ৩৬-৩৭।

৬৭. অমিতা সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৮।

৬৮. সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, *শান্তিনিকেতনের স্মৃতি,* পৃ. ২৮০-৮১।

৬৯. শোভন সোম, *'রবীন্দ্রনাথ-দিনেন্দ্রনাথ : সম্পর্কের খতিয়ান'*, অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৩৯৭, পৃ ৮৭।

৭০. এম. কে. গান্ধি, *অ্যান অটোবায়োগ্রাফি,* পৃ. ৩১৮-১৯।

৭১. *রবিজীবনী* : ৭, পৃ. ৭০; প্রমথনাথ বিশী, পৃ. ৯৩-৯৪।

৭২. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৮-৯৯; হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০।

৭৩. জগদানন্দ রায়, *'স্মৃতি',* বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬; পৃ. ৩৩৭।

৭৪. অমিতা সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭; *'শান্তিনিকেতন'* পত্রিকা-সংকলন, পৃ. ১-২, ৯।

৭৫. *'শান্তিনিকেতন'* পত্রিকা-সংকলন, পৃ. ১৩-১৪।

৭৬. 'প্রাগুক্ত', পৃ. ৩।

৭৭. *বিশ্বভারতী পত্রিকা,* শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০১। সৈয়দ মুজতবা আলী, *গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন,* পৃ. ৫৯-৬০।

৭৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী, পৃ. ৭৩. ৮১-৮২।

৭৯. *শিক্ষাচিন্তা,* পৃ. ১৭৯।

৮০. এলম্‌হার্স্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬।

শ্রীনিকেতন : শিক্ষাসত্র

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯০১ সালে; আর এর ২৩ বছর পর শ্রীনিকেতনে গড়ে উঠল আর-একটি নতুনধরনের বিদ্যালয়: 'শিক্ষাসত্র'।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম ততদিনে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়েছে; প্রথম পর্বের অনিশ্চয়তা, আর্থিক সমস্যাও অনেকটা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও যে রবীন্দ্রনাথ আবার একটি নতুন বিদ্যালয়ের কথা চিন্তা করলেন, তার কারণ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় নিয়ে তাঁর মনে ইতিমধ্যে কিছু অসন্তোষ জমা হয়েছিল। এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয় যাচ্ছিল যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমই শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে হবে—সেই অনুযায়ী পরীক্ষা-ব্যবস্থাও প্রর্বতিত হবে সেই বিদ্যালয়ে। সামাজিক চাপে এই পরিবর্তনগুলি মেনে নিতে হচ্ছিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারছিলেন, এর ফলে তাঁর বিদ্যালয়ের প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয় চালাতে গেলে এই সামাজিক দাবি একরকম মেনে নিতেই হয়। আবার তা মেনে নিলে যে-আদর্শ থেকে তিনি বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন, সেই আদর্শের অনেকটাই ত্যাগ করতে হয়। শান্তিনিকেতন ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ তাই এইসময় মন দিলেন শ্রীনিকেতনের দিকে। ১৯৩০ সালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তিনি অনায়াসেই বলতে পারলেন, 'ধনী ঘর থেকে যারা আসে তারা সবাই জীবিকানির্বাহের জন্য পরীক্ষা পাশ করে ডিগ্রি নিতে উৎসুক। তাই তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণেই আমি আরেকটি স্কুল খুলি। ....এই অপর স্কুলটিতে পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য যা কিছু আমি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, তা প্রবর্তনের চেষ্টা করছি।'[১]

শান্তিনিকেতনের পাশাপাশি 'শ্রীনিকেতন' নামের আর-একটি প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি তখন শিক্ষা-সংস্কার বা আনন্দময় শিক্ষার একটি আয়োজনের কথাই কেবল ভাবছেন না। তাঁর প্রধান লক্ষ্য : গ্রাম-পুনর্গঠন। তিনি লক্ষ করেছেন, গ্রামগুলো মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে—মানুষের কোনো উদ্যম নেই, মনে আনন্দ নেই, শ্রী আর সৌন্দর্য হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামজীবন থেকে। ১৯২১ সালে আমেরিকায় গিয়ে তাঁর এই যন্ত্রণা আর উদ্বেগের কথাই রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে- ছিলেন লেনার্ড এলম্‌হার্স্টকে। এলম্‌হার্স্ট

তখন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন। ভারতের গ্রামজীবন নিয়ে তিনি আগ্রহী। রবীন্দ্রনাথ এলম্‌হার্স্টকে বললেন, শান্তিনিকেতন থেকে সামান্য দূরে সুরুলে তিনি গ্রাম-পুনর্গঠনের একটি কাজ শুরু করতে চান। এলম্‌হার্স্ট কি তাঁর সেই উদযোগে সামিল হবেন?[২]

এলম্‌হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। পরের বছর প্রধানত তাঁরই নেতৃত্বে শুরু হয় শ্রীনিকেতনের প্রকল্প। অর্থসাহায্য এসেছিল এলম্‌হার্স্টেরই প্রেয়সী এবং পরে পত্নী ডরোথি স্ট্রেট নামে এক ধনী নারীর কাছ থেকে। এলম্‌হার্স্টের প্রধান সহযোগী ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোপাল ঘোষ এবং কালীমোহন ঘোষ। আমরা আগেই জেনেছি, বিদেশ থেকে ফিরে রথীন্দ্রনাথ তাঁদের জমিদারিতে কৃষি নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু করেছিলেন। তারপর সুরুলেও তিনি গ্রাম-সংস্কারের কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন; কিন্তু সে-কাজ খুব বেশিদূর এগোতে পারেনি। সেই অসম্পূর্ণ কাজই এবার সংগঠিত আকারে শুরু হলো সুরুলের শ্রীনিকেতনে। এলম্‌হার্স্ট প্রতিষ্ঠানটির নাম দিয়েছিলেন 'ইনস্টিটিউট অফ রুরাল রিকনস্ট্রাকশন'। রবীন্দ্রনাথ নতুন নাম দিলেন : 'শ্রীনিকেতন'। শ্রীহীন গ্রামকে শ্রীমণ্ডিত করে তোলার এক অভিনব উদ্যোগ। 'শিক্ষাসত্র' বিদ্যালয়টি ছিল এই প্রয়াসেরই একটি অঙ্গ। এরকম একটি প্রকল্পের কথা রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলেন।

দেশের রাজস্বের প্রধান অংশটাই আসে কৃষকদের কাছ থেকে। অথচ সেই অর্থ ব্যয়িত হয় প্রধানত উচ্চশ্রেণীর স্বার্থে। এই অবিচার রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল। ১৯১৭ সালে কলকাতায় একটি বক্তৃতায় তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'দেশের যে রাজস্ব হইতে আমাদের উন্নত শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার বেশির ভাগ অর্থ আমাদের এই অশিক্ষিত কৃষকেরাই যোগাইতেছে।.... তাহাদের শ্রমের ধন আমরা ভোগ করি, কিন্তু বিনিময়ে আমরা কি দিয়াছি?' রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বললেন, 'এই ব্যবধান দূর করিবার উপায় শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।' (*'প্রবাসী'*, কার্তিক ১৩২৪) এই উদ্যোগই তিনি নিজের হাতে নিলেন প্রথমে শ্রীনিকেতন এবং তার দু'বছর পরে 'শিক্ষাসত্র' স্থাপন করে। এখানে আমাদের আলোচনা শ্রীনিকেতনের বিশিষ্ট বিদ্যালয় 'শিক্ষাসত্র'-কে নিয়ে।

শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-পুনর্গঠন উদ্যোগের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন উমা দাশগুপ্ত, সুকুমার মল্লিক প্রমুখ। শ্রীনিকেতনে একটি কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল এবং ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'ব্রতীবালক' আর 'ব্রতীবালিকা' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরি করে আশপাশের গ্রামে শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসচেতনা প্রসার, গ্রামবাসীদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা ইত্যাদি কাজ শুরু করা হয়। কৃষি-বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল ১২ জন ছাত্রকে নিয়ে। কৃষি বা হস্তশিল্প—কোনো-একটি বিষয়কে শেখার জন্য বেছে নেবার স্বাধীনতা তাদের ছিল। এছাড়া হাঁসমুরগি পালনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল; ক্রমে সে-দায়িত্ব ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আশ্রম-পত্রিকা 'শান্তিনিকেতন'-এ (মার্চ-এপ্রিল, ১৯২২) প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানতে পারি, এ-দায়িত্ব ছাত্ররা ভালোভাবেই পালন করতে পারছে। কৃষিকাজেও তারা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ছাত্রদের হাতে-ফলানো বাদাম, মুলো, টোমাটো, বেগুন, বরবটি ইত্যাদি নিয়ে একটি প্রদর্শনী করা হয় ওই বছর পৌষমেলার অনুষ্ঠানে। গাছকে পোকামাকড়ের হাত থেকে কী-করে রক্ষা করতে হবে—সেই বিষয়েও একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন কালীমোহন ঘোষ। ছাত্রদের পরিচালনায় গ্রামে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির ব্যবস্থাও করা হয়। (১৯৯৯ সালেও এই লাইব্রেরি চলত বলে জানতে পারি)।

সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুর পর শ্রীনিকেতন-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ই.ডবলিউ আর্যনায়কম। তাঁর নেতৃত্বে ছাত্রদের আগুন নেভানো এবং প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়; তারা কুইনিন প্রয়োগ করতে শেখে; গ্রামে-গ্রামে ঘুরে যুবকদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। গ্রাম-সংস্কারের কাজেও ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মহিদপাড়া এবং ভুবনডাঙা গ্রামে তারা নালা কেটে জমা-জল বের করে দেয়; সুরুলের বাগদিপাড়া অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করে। এর পাশাপাশি চলছিল গ্রামবাসীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ।[৪] ১৯২২ সালে দুটি অন্ধ সাঁওতাল ছেলে বাঁশের কাজ শিখতে এসেছিল। ১৯২৩ সালের প্রথম দিকেই রায়পুর এবং লোহাগড় গ্রাম থেকে দুজনকে কাঠের কাজ এবং তাঁতবোনার কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ওই বছরের মাঝামাঝি সময় একজন সাঁওতাল ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছিল; তিনি তাঁতের কাজে গ্রামবাসীদের ট্রেনিং দেন। ওই সময়েই ২০ জন ছাত্রী নিয়ে সুরুলে একটি বালিকা-বিদ্যালয় গঠন করা হয়। ১৯২৪ সালে এই প্রয়াস আরও বিস্তৃত হয়।

চামড়ার কাজ, গালার কাজ, তাঁতবোনা এবং কাঠের কাজের প্রশিক্ষণ-কর্মশালায় গ্রামবাসীরা সোৎসাহে যোগ দেন।[৫]

শিক্ষাসত্রে প্রথমেই স্থির করে নেওয়া হয়েছিল, গ্রামের শিশুরাই হবে শিক্ষার্থী। পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি পাবার তাড়না তাদের নেই। বিদ্যালয় থেকে যে-শিক্ষা তারা পাবে, তা তারা কাজে লাগাবে তাদের ব্যবহারিক জীবনে। উত্তরজীবনে সেই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে তারা তাদের গ্রামের শ্রী এবং সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে ব্রতী হবে। এই আদর্শের পরিকল্পেই রচিত হয়েছিল বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের কর্মসূচিটি। কোনো স্থিরনির্দিষ্ট পাঠক্রম নেই। শ্রেণিবিভাগ নেই। পরীক্ষার উপদ্রব নেই। এখনকার ভাষায় যাকে 'নন-ফরমাল' শিক্ষা বলা হয়, তারই এক চমৎকার প্রবর্তনা ছিল শিক্ষাসত্রের আদর্শে। মহাত্মা গান্ধির 'নঈ তালিম' বা বুনিয়াদি শিক্ষা-প্রস্তাবের ১৩ বছর আগেই শুরু হয়েছিল এই উদ্‌যোগ।

VISVA-BHARATI

Bulletin No. 21

SIKSHA-SATRA
An Experiment in Rural Education
at
SRINIKETAN

JANUARY, 1949 Price : Annas Eight Only.

পুনর্মুদ্রণ : ১৯৪৯

শিক্ষাসত্র

'শিক্ষাসত্র' বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২৪ সালের পয়লা জুলাই, শান্তিনিকেতনে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে। সন্তোষচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর ১৯২৬ সালে বিদ্যালয়টি নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীনিকেতনে। একেবারে সূচনায় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ছয়। পরিকল্পনাটি এরকম ছিল যে, ছাত্ররা চাষবাস এবং হাতের কাজ শেখার ভেতর দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার একটা শিক্ষা পাবে এবং পরবর্তী জীবনে সেই শিক্ষাকে তারা তাদের জীবনে প্রয়োগ করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। প্রথম ছ'টি ছাত্র এসেছিল 'নিম্নবর্ণ' হিন্দু পরিবার থেকে; কয়েকজন ছিল অনাথ। পরে কয়েকটি আদিবাসী এবং মুসলমান ছাত্রও বিদ্যালয়ে যোগ দেয়। তারা সকলে একই ঘরে একটা পরিবারের মতো থাকত; রান্না ছাড়া ঘরের আর-সব কাজই তারা নিজেরা করত।

প্রতিটি ছাত্রকে দেওয়া হয়েছিল এক টুকরো করে জমি; সেই জমিতে বাগান করার ভেতর দিয়ে চাষবাসের একটা প্রাথমিক ধারণা তারা পেয়ে যাবে, এরকমই ভাবা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, নিজে বাগান করার ভেতর একটা আনন্দও আছে। সেই আনন্দময় চর্চার ভেতর দিয়েই তারা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিখে নিতে পারবে; বলা হয়েছিল: ওই জমিটি হবে প্রতিটি ছাত্রের 'ক্রীড়া এবং নিরীক্ষার ক্ষেত্র'। এছাড়া প্রত্যেক ছাত্র পছন্দমতো একটি হস্তশিল্পকে শেখার বিষয় হিসাবে বেছে নিতে পারত। শিক্ষাসত্রে এর আয়োজন ছিল ব্যাপক : তাঁতবোনা, কাপড় রঙ করা, কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, বই-বাঁধাই ইত্যাদি নানাধরনের হাতের কাজের কোনো-একটিকে নির্বাচন করে নেবার সুযোগ ছিল। লেখাপড়া বা সাক্ষরতার জন্য দিনের কর্মসূচিতে সময় রাখা হয়েছিল মাত্র এক ঘণ্টা। অন্যান্য বিষয়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যবই বা পাঠক্রম ছিল না। কাজের ভেতর দিয়েই ছাত্র প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জেনে নেবে— এইরকমই ভাবা হয়েছিল।[৭]

এই ভাবনার পিছনে যে-দর্শন ছিল, তা হলো : বিদ্যালয় 'শিক্ষার্থীর 'আত্মপ্রকাশ এবং আনন্দময় জীবনচর্চার এক ক্ষেত্র'। এলম্‌হার্স্ট মনে করতেন, শিশুরা শুধু খেলার জগৎ নিয়েই থাকতে ভালোবাসে, এটা ভুল ধারণা। শৈশবের ভেতরেই বরং ভবিষ্যৎ জীবনের পটভূমি তৈরি হয়ে যায়। শিশুরা যে খেলা করে, সেটা কোনো অর্থহীন মজার ব্যাপার নয়; 'পরিণত জীবনের প্রতিটি স্তরের

আভাস' সে তার এই অভিজ্ঞতা থেকে পেয়ে যায়। এই সুযোগ থেকে শিশুকে বঞ্চিত করা মানে তার 'আত্মপ্রকাশ আর আত্মসংরক্ষণের' সুযোগ বা সম্ভাবনাটিকে নষ্ট করে দেওয়া।[৮]

এলম্‌হার্স্টের এই চিন্তার পিছনে তাঁর সমকালীন শিক্ষাদর্শন—ফ্রোয়েবল, ডিউয়ি এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। ১৯২৪ সালে 'শিক্ষাসত্র' প্রতিষ্ঠার সময়কালেই এলম্‌হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কিছু ভাবনার কথা লিখে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলছেন, শিক্ষায় শারীরিক ক্রিয়ার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে; কারণ আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এক নিজস্ব প্রকাশ-ক্ষমতা আছে। শুধু শব্দ দিয়ে নয়, ওইসব অঙ্গের ক্রিয়াকর্মের ভেতর দিয়েও আমরা আমাদের 'আবেগ এবং অনুভূতিকে প্রকাশ করে থাকি'। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার পরিকল্পে নৃত্যগীতের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ আর-একটি নতুন মাত্রা নিয়ে আসছেন। শুধু আনন্দের জন্যে নয়, আমাদের মনের ভাব, আবেগ, অনুভূতিকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্যেও শিক্ষায় শরীরচর্চার একটা বিশেষ স্থান আছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করছেন।[৯] শিক্ষাসত্রের রূপকল্পে এই দর্শনের প্রভাব নানাভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। এই শিক্ষা নিছক বৃত্তিশিক্ষা নয়, 'পূর্ণ জীবনযাপনের' শিক্ষা।

আনন্দ আর অবসর রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের দু'টি প্রধান স্তম্ভ বলা যায়। শিক্ষাসত্রের দৈনিক কর্মসূচিতেও তার অভাব ছিল না। ছাত্রদের এক অর্থে বেশ কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হতো। ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা, ঘর পরিষ্কার করা, নিজের জামাকাপড় নিজে কাচা, রান্নার কাজে সাহায্য করা। সকাল নটার মধ্যে এইসব কাজ শেষ করে তারা চলে যেত বাগানের জমিতে বা হাতের কাজ শেখার জায়গায়। সেই চর্চা অন্তত দু-ঘণ্টা। সমস্ত কাজগুলোই সময় ধরে এবং নিয়ম মেনে করতে হতো। তবে এই নিয়ম যেন পীড়ন না হয়ে ওঠে, সেদিকেও বিদ্যালয়ের নজর ছিল। এলম্‌হার্স্টের বক্তব্য ছিল, বিদ্যালয় কেবল বিকাশের ক্ষেত্রটা জুগিয়ে দিতে পারে; তারপর গাছপালার মতোই শিশুরা বেড়ে উঠবে প্রকৃতির নিয়মে। সারাদিনের কাজ- কর্মের পর সন্ধেবেলাটা ছিল শুধুই গানবাজনা আর গল্পগুজবের সময়।

শিক্ষাসত্রের কোনো স্থিরনির্দিষ্ট পাঠক্রম ছিল না, আমরা শুনেছি। পাঠ্যবইও ঠিক নিয়ম করে ব্যবহার করা হতো না। তবে মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকরা এসে কিছু ক্লাস নিতেন। রথীন্দ্রনাথ নিজে এবং জগদানন্দ রায়ও ক্লাস নিয়েছেন। হস্তশিল্পশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল নন্দলাল বসুর। কাজ করতে-করতে ছাত্ররা যখন যে-বিষয়টি জানার প্রয়োজন মনে করত, সেটাই হয়ে যেত শেখার বিষয় বা সাবজেক্ট। যেমন, বিভিন্নধরনের সার এবং সেচপাম্পের ব্যবহার বুঝতে গিয়ে শেখা হয়ে যেত রসায়ন আর পদার্থবিদ্যার কিছু প্রাথমিক সূত্র। জমির উর্বরতার বিষয় থেকে ভূ-তত্ত্বের প্রসঙ্গ। গাছপালাকে পোকামাকড়ের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়? সেই বিষয়ে জানতে গিয়ে কীটপতঙ্গ বা জীববিদ্যার কিছু প্রসঙ্গ তাদের পাঠক্রমে চলে আসত। প্রকৃতিপরিচয় আলাদাভাবে কোনো পাঠ্যবিষয় ছিল না; গাছপালা, পশুপাখির প্রকৃতি নিরীক্ষণের ভেতর দিয়ে ছাত্ররা পেয়ে যেত উদ্ভিদ আর জীববিদ্যার একটা প্রাথমিক ধারণা।[১০]

ছাত্রদের মাঝেমাঝে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হতো। যে-জায়গাটি তারা দেখছে, তার একটা মানচিত্র আর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখে রাখতে হতো তাদের। এইভাবে প্রাসঙ্গিক ভূগোল আর ইতিহাসের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় হয়ে যেত। বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা গোশালা এবং মুরগিপালন-কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছিল। তার হিসেবপত্রও ছাত্রদের রাখতে হতো। এবং তার ভেতর দিয়ে লেখা আর প্রাথমিক পাটিগণিতের একটা চর্চা হয়ে যেত তাদের। বাগানের কাজ করতে গিয়ে তাদের জানতে হতো জলবায়ু আর বৃষ্টিপাতের বিজ্ঞান; বিভিন্ন শাকসবজির খাদ্যগুণ। হাতের কাজের জন্য বিভিন্ন বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন হতো। সেগুলো কোথায় তৈরি হয়, কীভাবে জোগান আসে, বাজারে তাদের দাম কীরকম—এইসব জানতে গিয়েও ভূগোল আর অর্থনীতির কিছু ধারণা পেয়ে যেত ছাত্ররা। তারা সংগ্রহ করে আনত এলাকার বিভিন্ন গাছপাতা, ফুল-ফল, বীজ, পাথর ইত্যাদির নমুনা; আর তাদের সেই সংগ্রহের বস্তু থেকেও উঠে আসত নতুন-নতুন শেখার বিষয়।[১১] প্রকৃতি আর পরিবেশচেতনা একেবারে সংলিপ্ত হয়েছিল তাদের প্রতিদিনের জীবনচর্চায়।

১৯২৮ সালে 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'-তে (পৃ. ১২৭) রবীন্দ্রনাথ এক

মুক্তশিক্ষার কথা বলেছিলেন; এর নাম দিয়েছিলেন তিনি : 'খোলা পথের শিক্ষা' বা 'পথ চলার শিক্ষা'। এই মুক্তশিক্ষাই ছিল শিক্ষাসূত্রের পাঠসূচি। কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট ছক নয়, কোনো বিশেষ প্রণালীবদ্ধ শিক্ষা নয়। জীবনের প্রয়োজনে যখন যতটুকু দরকার, ততটুকুই শিখে নেওয়া হচ্ছে এবং সেই শেখার কাজটা চলছে হাতে-কলমে কাজ করতে-করতে।

মনে হতে পারে, এই শিক্ষা যেন বড়ো বেশি ব্যবহারিক প্রয়োজননির্ভর; সে হিসাবে এর পরিসর যেন কিছুটা সংকীর্ণ। এই যুক্তি একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। তবে আনন্দ, স্ফূর্তি আর সৃজনশীলতার একটা পরিমণ্ডলেই ছাত্ররা কাজ করত। নিয়মনিয়ন্ত্রিত দিনসূচিটি প্রয়োজনে পরিবর্তন করে নেওয়ার স্বাধীনতাও তাদের ছিল। কোনো-একদিন রাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে; বাগানের মাটি ভিজে আছে। এ-অবস্থায় পরের দিন সকালে লেখাপড়া শেখার ক্লাসে না গিয়ে ছাত্ররা বাগানেই দিনটা কাটিয়ে দিতে পারত। হাতের কাজ শেখার প্রণালীতেও একটা সৃষ্টির আনন্দ তারা পেত। গাছপাতা থেকে রঙ তারা নিজেরাই তৈরি করে নিত। নিজেদের জামাকাপড় এবং ব্যবহারের অন্যান্য জিনিসও অনেক সময় তারা নিজেরাই প্রস্তুত করে নিত।[১২]

১৯২৮ সালের ছাত্র কালিদাস ঘোষ তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, 'আমাদের কোনো নির্দিষ্ট ক্লাস ছিল না। ছোট-বড় দু'ভাগে ভাগ করে পাকুড়তলা বাড়ির নিচে আমাদের ক্লাস হ'ত।....সবাইকে খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে পালা করে ঘর ঝাঁট দিতে হ'ত। তারপর যে যার জলখাবার খেয়ে গাছতলায় ক্লাসে যেতাম। সকালের দিকটা পড়াশোনা হতো। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর হাতের কাজ ও শেষে বাগানের কাজ করতাম।.....গল্পের আসর বসত সন্ধ্যায়।'[১৩]

হাতের কাজের শিক্ষায় নানারকম বৈচিত্র্য ছিল। প্রতিটি কাজকে একটা সৃজনশীলতার চর্চা মনে করা হতো; কিন্তু তাই বলে হস্তশিল্পের নামে কেবল শৌখিন কারুশিল্প বোঝাত না। ১৯২৮ সালের প্রতিবেদনে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিল, ছাত্ররা যা তৈরি করতে শিখছে, তার যেন একটা 'ব্যবহারিক মূল্য' থাকে এবং তা যেন 'বিক্রয়োপযোগী' হয়। ছাত্রদের তৈরি কাপড়-গামছা, চেয়ার-ডেস্ক বাজারে এবং মেলায় বিক্রিও হতো। কোনো-কোনো ছাত্র এইসব কাজে বেশ দক্ষ হয়ে ওঠায়, তাদের কিছু পারিশ্রমিকও দেওয়া হতো, যাতে এই

অর্থ দিয়ে তারা থাকা-খাওয়ার খরচ চালাতে পারে। বিদ্যালয়টি প্রথমে ছিল অবৈতনিক। কিন্তু পরে ছাত্রদের পারিশ্রমিক দিয়ে, তার থেকে তাদের থাকা-খাওয়ার খরচ তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়। এর একটা অন্য গুরুত্বও ছিল। মনে করা হয়েছিল, এর ফলে ছাত্রদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, বিদ্যালয়টিও দানসত্র হয়ে থাকবে না।[১৪]

শিক্ষাসত্রের একাধিক প্রতিবেদনে এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হলো গ্রামের শিশু বা কিশোরদের স্বাবলম্বী করে তোলা; শুধু জীবিকার জন্য কোনো শিক্ষা নয়; এমন-একটি শিক্ষা, যার সাহায্যে তারা তাদের গ্রামজীবনকে উন্নত এবং শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে পারবে।[১৫] তাদের পরিচয় হবে একজন 'স্বাধীন, স্বাবলম্বী কৃষক বা কারুশিল্পী'।[১৬]

১৯৩০ সালে শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এই উদ্যোগ হলো জনসাধারণের 'শক্তিসমবায়ের সাধনা'; গ্রামবাসীদের প্রতি তাঁর আবেদন ব্যক্ত হয়েছিল এইভাবে : 'এসো তোমরা, প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে। আমাদের সহযোগী হও....গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ হয়ে সবল হয়ে উঠুক।'[১৭]

গ্রামবাসীদের লুপ্ত আত্মসম্মান ফিরিয়ে দিতে হবে। গ্রামে আবার আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করে দিতে হবে, এই কথাগুলি শ্রীনিকেতন এবং গ্রামজীবন-সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি রচনাতেই ফিরে-ফিরে এসেছে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে শ্রীনিকেতনের সভায় তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে যান, 'গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না। যে-শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন, তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে।.....শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।'[১৮]

খুব ছোটো আকারে শুরু হলেও শিক্ষাসত্রের লক্ষ্য ছিল অনেক দূরপ্রসারী। এলম্‌হার্স্ট চেয়েছিলেন, শিক্ষাটি এমন হবে, যাতে শুধু ব্যক্তিজীবনের উন্নতি নয়, গ্রাম বা গোষ্ঠীজীবনের উন্নতির একটা আদর্শও ছাত্রদের ভেতর সঞ্চারিত হতে পারে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হয়েছিল সমগ্র পরিকল্পনাটি।* ছাত্রদের

* বিশ্বভারতী বুলেটিনের ২১ নং সংখ্যায় (১৯৩৬) শিক্ষাসত্রের ওপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। লোকশিক্ষা সংসদের বিষয়ে জানা যায় ২৩ নং সংখ্যায় (১৯৩৭)।

ভেতর সাংগঠনিক দক্ষতা এবং নেতৃত্বগুণ বিকাশের লক্ষ্যে কয়েকটি ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। ছাত্রদের কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলের পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিল একজন ক্যাপটেন বা অধিনায়ককে। শ্রীনিকেতনের জন্যে গঠন করা হয়েছিল 'ব্রতীবালক' নামের একটি সংগঠন। পরে মেয়েদের নিয়ে 'ব্রতীবালিকা'-র দলও গড়ে ওঠে। এদের দায়িত্ব ছিল, গ্রামে-গ্রামে ঘুরে মানুষকে সাহায্য করা, স্বাস্থ্যচেতনা প্রচার করা। কলেরা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি বিষয়ে পৌষমেলাতেও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো। বালিকা বিদ্যালয়, আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য দুটি নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপন করা হয়। গ্রামের রাস্তা নির্মাণ, জমা-জল পরিষ্কার করা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা-পরিষেবার উদ্যোগও শ্রীনিকেতনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এইসব কাজে খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দেয় ব্রতীবালকেরা।[১৯]

শ্রীনিকেতনের এই বৃহত্তর কর্মোদ্যোগের অংশ শিক্ষাসত্রেও সেই আদর্শের অনুসৃতি লক্ষ করা যায়। একটি প্রতিবেদনে এই লক্ষ্যের কথা লেখা হয়ছিল খুব সুন্দর করে : 'গ্রামের সমস্যাকে জানা, বোঝা আর পর্যালোচনার জন্য ক্লাসে নিয়ে যাওয়া' আর 'সেই আলোচনার ভেতর দিয়ে যে-জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা হলো, তাকে আবার গ্রামেই পৌঁছে দেওয়া'।[২০]

কবির স্বপ্ন আর আদর্শ

১৯৩০ সালে রাশিয়ায় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথালাপে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, আমরা জেনেছি। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি এ-ও বলেছিলেন যে, 'অনতিকাল পরে এই গ্রামের ইস্কুলটিই সত্যিকার আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে উঠবে, অন্যটি তখন পাবে অবহেলা'।[২১] শিক্ষাসত্র বা 'গ্রামের স্কুলটিকে' রবীন্দ্রনাথ কতটা গুরুত্ব দিচ্ছিলেন, তা ওই উক্তি থেকেই বোঝা যায়। ১৯৩৭ সালে তিনি এলম্‌হার্স্টকে একটি চিঠিতে স্পষ্টভাষায় লেখেন, শান্তিনিকেতন কলেজ আর বিদ্যালয়ের চাইতে শিক্ষাসত্রের সম্ভাবনাকেই তিনি অনেক বেশি গুরুত্ব দেন : 'I myself attach much more significance to the educational possibilities of Siksha-satra than to the school and college at Santiniketan.' শান্তিনিকেতন ক্রমশই একটা গতানুগতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছে, শিশুদের মনকে সেখানে খাঁচায় পুরে দেওয়া হচ্ছে, এমন মন্তব্য তাঁর ওই চিঠিতে ছিল।[২২]

জীবনের শেষ পর্বে শ্রীনিকেতন-ই যেন রবীন্দ্রনাথের আশা আর স্বপ্নের নিকেতন হয়ে উঠেছিল। তাঁর একাধিক রচনা বা ভাষণে এর ইঙ্গিত ছড়িয়ে আছে। ১৯৩৯ সালে শ্রীনিকেতন-কর্মীদের একটি সভায় তিনি তাঁর সেই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেন এইভাবে : 'খোলা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে— সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা-কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল ক'খানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি করে দাও। আমি বলব, এই ক'খানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ।' [২৩]

রবীন্দ্রনাথ যখন এই কথা বলছেন, মহাযুদ্ধের ছায়া তখনই দেশের অর্থনীতিকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। তিরিশের দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দার পর গ্রামের অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়েছে। এ-অবস্থায় একটি পুনর্গঠন কর্মসূচির সাহায্যে গ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করা বোধহয় সম্ভব ছিল না। সে-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় একটা আদর্শের আবেগই প্রধান প্রেরণা হয়েছিল, বলা যেতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েক বছরের মধ্যেই শ্রীনিকেতন-প্রকল্প যে নানাভাবে বিকৃত এবং রূপান্তরিত হয়ে গেল, তার বাস্তব পটভূমিটা যেন আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শ্রীনিকেতনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাসত্রও আদর্শভ্রষ্ট হয়ে ক্রমে একটা গড়পড়তা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৪৫ সালে বিদ্যালয়ে একটি স্থিরনির্দিষ্ট পাঠক্রমের প্রবর্তন করা হয়েছিল; এরপর ১৯৫৪-৫৫ সালে তা একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রূপ নেয়। এর আগে শ্রীনিকেতনে একটি বালিকা- বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। সেই স্কুলটিকেও এইসময় শিক্ষাসত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়।

এমন পরিণতি কেন হলো, তার কারণগুলি নানা দিক থেকে খুঁজে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ গ্রামের মানুষ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন, বলা যায় না। প্রথম আমলের ছাত্র কালিদাস ঘোষ স্বীকার করেছেন, তিনি শেষ পর্যন্ত 'গুরুদেবের' অনুমতি নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন। শিক্ষাসত্রের শিক্ষাকে তিনি যথেষ্ট মনে করেননি, এটা বোঝা যায়।[২৪]

আর-একজন ছাত্রের বক্তব্য ছিল, সে শিক্ষাসত্রে চামড়ার কাজ শিখেছিল; কিন্তু মায়ের নিষেধে ওই 'মুচির কাজকে' সে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি।[২৫] ১৯৫৮ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, কৃষিই ওই অঞ্চলে

গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা হয়ে আছে। হস্তশিল্পের যে-প্রশিক্ষণ শিক্ষাসত্র থেকে দেওয়া হয়েছিল, তা খুব কাজে আসেনি।[২৬]

স্বাধীনতার পর ভারতরাষ্ট্র যে-ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়, তার সঙ্গে শিক্ষাসত্রের আদর্শের কোনো মিল ছিল না। গান্ধিজীর বুনিয়াদি-শিক্ষা প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনেতারা মহাত্মা এবং গুরুদেবকে পূজ্য বিগ্রহ হিসাবেই রেখে দেন—তাঁদের চিন্তা এবং আদর্শের সার-সংকলন করে সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তেমন উদযোগ দেখা যায়নি। এ-অবস্থায় সমস্ত দেশের সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন হয়ে একটি শিক্ষায়তন খুব বেশিদিন তার স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে পারে না। শিক্ষাসত্রও তাই শেষ পর্যন্ত একটি সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হলো।

শ্রীনিকেতনের ভেতর এবং বাহিরের পরিমণ্ডলও খুব অনুকূল ছিল না। ১৯৪০-র দশকের পর থেকেই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। গ্রামের লোকেদের দিক থেকেও একটা দাবি ছিল যে, তাদের সন্তানদের সরকারি পরীক্ষা দেবার সুযোগ করে দেওয়া হোক। বিদ্যালয় শুরু হয়েছিল ছ-টি ছাত্র নিয়ে। প্রথম কুড়ি বছরে ছাত্রসংখ্যা গড়ে ২৫-এর বেশি কোনো সময়ই হয়নি। ১৯২৯ সাল নাগাদ ছাত্রসংখ্যা ৩০-এর কাছাকাছি পৌঁছেছিল; কিন্তু ১৯৪৯ সালে তা আবার নেমে দাঁড়ায় : ২১।[২৭] গ্রামের পরিবারগুলিকে বিদ্যালয়টি যে যথেষ্ট আকর্ষণ করতে পারেনি, ছাত্রসংখ্যার এই হিসাব থেকেই তা বোঝা যায়। অর্থসংকটও বিভিন্ন কর্মসূচিকে বারবার ব্যাহত করতে থাকে।[২৮]

সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের অকালমৃত্যুর পর বিনায়ক মাসোজি, ইন্দুসুধা ঘোষ, পি. সি. লাল, কে. পি. মুখার্জি প্রমুখ বিভিন্ন ব্যক্তি কিছুদিন করে বিদ্যালয়টি পরিচালনার দায়িত্ব নেন। আর্যনায়কম-দম্পতি এবং মারজোরি সাইক্সের মতো গান্ধিবাদী সংগঠকরাও কিছুদিন যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ক্রমে বিদ্যালয়ের পরিচালনভার এমনসব ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ল, যাঁদের চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের মিল সামান্যই। বিশ্বভারতীর সঙ্গে শ্রীনিকেতনের একটা রেষারেষির সম্পর্কও তৈরি হয়েছিল। এলম্‌হার্স্ট দুঃখ করে লিখেছেন, বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের অনেকেই শ্রীনিকেতনের গুরুত্ব বুঝতে চাইতেন না। তাঁদের মনে হতো, গ্রামের ওই প্রতিষ্ঠানটির জন্যে অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে।[২৯] অন্যদিকে

পি. সি. লাল ১৯৩২ সালেই লিখেছিলেন, অর্থাভাবে অনেক কাজ করা যাচ্ছে না।[৩০] যথেষ্ট অর্থ এবং যথার্থ কাজের লোকের অভাবের কথা কৃষ্ণপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ও তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।[৩১]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মনে করতে লাগলেন, 'গ্রামের লোকে এসব চায় না।' অতএব পাঠভবনের শিক্ষাক্রমই শিক্ষাসত্রে চালু করা হলো।[৩২] হাতের কাজ হয়ে দাঁড়াল রুটিনবাঁধা বৃত্তিশিক্ষা। বাগানের কাজের সঙ্গে অন্য শিক্ষার আর কোনো সম্পর্ক রইল না। পরিচালকরা ক্রমে শিক্ষাসত্রকে একটা গড়পড়তা স্কুল হিসাবেই দেখতে শুরু করলেন।[৩৩]

পুরোনো আদর্শের সঙ্গে নতুন ধারাকে মিলিয়ে নিয়ে চলার একটা চেষ্টা প্রথম কিছুদিন হয়েছিল। ক্রমে নতুন ধারাটাই প্রধান হয়ে উঠল, অবলুপ্ত হলো সূচনাকালের আদর্শটি। পঞ্চাশের দশকের ছাত্রী সুনীতা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, তাঁর সময় সেলাইশিক্ষাটা কেবল মেয়েদের জন্যেই বরাদ্দ ছিল।[৩৪] সেলাইফোঁড়াইয়ের কাজ মেয়েদের একটু শেখা দরকার-এটা একেবারেই পুরুষসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের কোনো সম্পর্ক নেই।

বাগান এবং হাতের কাজ তখনো কাগজে-কলমে আছে; কিন্তু নতুন যে-পাঠক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে, তার সঙ্গে ওইসব কাজের কোনো যোগ নেই। পাঠক্রমের পরিশিষ্ট হিসাবেই যেন সেগুলি রেখে দেওয়া হয়েছে এবং শেখানো হচ্ছে যান্ত্রিকভাবে, পালনীয় কৃত্য হিসাবে।[৩৫] হাতের কাজের সঙ্গে শিক্ষার এই-ধরনের বিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় কোথাও ছিল না। কবির আদর্শের সম্পূর্ণ সমাধি হয়ে গেছে ততদিনে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় একটা আদর্শকল্পনা নিঃসন্দেহে ছিল। যে-কোনো নতুন উদ্ভাবনের পিছনেই এই ভাবাবেগের প্রণোদনা থাকে, তা আমরা জানি। ১৯২০-র দশকে রবীন্দ্রনাথ যা ভেবেছিলেন, ১৯৫০-র দশকে তা অক্ষরে-অক্ষরে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁদের চিন্তার নির্যাসটুকু নিয়ে সময়ের চাহিদার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে সম্পূর্ণ নতুনধরনের একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ

স্বাধীনতার পর আমরা পেয়েছিলাম। এই বিকল্প ব্যবস্থার সাহায্যে ঔপনিবেশিক শিক্ষার কাঠামোকে বদলে ফেলার একটা সুযোগও আমাদের হাতে এসেছিল। স্বীকার করতেই হবে, সেই সুযোগ আমরা গ্রহণ করিনি। আর তার পরিণাম আজ আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। একদিকে ভারতের তথ্য-প্রযুক্তির কুশলতা, মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতের দক্ষতা সারা পৃথিবীতে সমাদৃত; অন্যদিকে অশিক্ষা আর নিরক্ষরতার লজ্জা বিশ্বের কাছে আমাদের মাথা নত করে দিয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

১. *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : শিক্ষাচিন্তা; সম্পাদনা* : সত্যেন্দ্রনাথ রায়; পৃ. ২৪২।

২. এল. কে. এলম্‌হার্স্ট, *পোয়েট অ্যান্ড প্লাউম্যান,* পৃ. ১৬।

৩. *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : শান্তিনিকেতন* (আশ্রমপত্রিকার সংকলন); সম্পাদনা : সুপ্তি মিত্র (এরপর থেকে 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' বলে উল্লেখ করা হবে।) পৃ. ৬১-৬২, ৮০, ১০৬-১০৭।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-৩২; এল. কে. এলম্‌হার্স্ট, *রবীন্দ্রনাথ টেগোর : পাইয়োনিয়ার ইন এডুকেশন.* পৃ. ৩২।

৫. *'শান্তিনিকেতন পত্রিকা',* পৃ. ১০৩, ১২১, ১৪৪-৪৫, ১৫৮। আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রীনিকেতন : রবীন্দ্রনাথ'স পেডাগজি ইন প্র্যাকটিস,* পৃ. ৯-১৩।

৬. *শিক্ষাসত্র* (রচনা-সংকলন), পৃ. ৫৬-৫৭।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪, ৯৪-৯৫।

৮. এলম্‌হার্স্ট, *পাইয়োনিয়ার ইন এডুকেশন,* পৃ. ৬৭, ৭৭, ৮৩। (এরপর থেকে শুধু *'পাইয়োনিয়ার'* বলে উল্লেখ করা হবে।)

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-৭।

১০. *শিক্ষাসত্র,* পৃ. ৯৩-৯৫, ১০৯।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৮।

১২. পি. সি. লাল, *রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এডুকেশন ইন রুরাল ইন্ডিয়া,* পৃ. ১৩৪-৩৬।

১৩. *শিক্ষাসত্র,* পৃ. ১৫৭।

১৪. পি. সি. লাল, পৃ. ১০৯; *শিক্ষাসত্র,* পৃ. ৬১,৭৬।

১৫. *শিক্ষাসত্র,* পৃ. ৯২-৯৪।

১৬. পি. সি. লাল, পৃ. ১৩০।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পল্লীপ্রকৃতি,* পৃ ৭৩।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

১৯. 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা', পৃ. ৫৫-৫৭, ১৩১-৩২।

২০. শিক্ষাসত্র, পৃ. ৫৪।

২১. *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : শিক্ষাচিন্তা,* পৃ. ২৪২।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫।

২৩. *পল্লীপ্রকৃতি,* পৃ. ১০৪।

২৪. *শিক্ষাসত্র,* পৃ. ১৫৮।

২৫. হাসিম আলি, *দেন অ্যান্ড নাউ,* পৃ. ৯২।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

২৭. *শিক্ষাসত্র,* পৃ. ১২৫।

২৮. পি. সি. লাল, পৃ. ১০৯-১১, ১২৭।

২৯. এলমহার্স্ট, *'পাইয়োনিয়ার',* পৃ. ৪১ : *পোয়েট অ্যান্ড প্লাউম্যান,* পৃ. ১৬২।

৩০. পি. সি. লাল, পৃ. ১২৭।

৩১. *শিক্ষাসত্র,* পৃ. ৬৫।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

৩৩. সুনীলচন্দ্র সরকার, *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা,* পৃ. ১৩৯-৪২।

৩৪. *শিক্ষাসত্র,* পৃ. ১৬১।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

শ্রীনিকেতনের স্বাস্থ্যসমবায় সমিতি

১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনের কাজ শুরু হয়েছিল একটি কৃষি-বিদ্যালয়কে নিয়ে। দু-বছর পরে গড়ে ওঠে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য 'শিক্ষাসত্র'। এই অভিনব বিদ্যালয়টিকে নিয়েই আমরা প্রধানত আলোচনা করেছি। কিন্তু শ্রীনিকেতনের কর্মক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছিল। ১৯৩৬ সালে 'লোকশিক্ষা সংসদ' এবং পরের বছর 'শিক্ষাচর্চাভবন' নামে আরও দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

গ্রাম সংস্কারের কাজও প্রসারিত হতে থাকে। শ্রীনিকেতন থেকে এইসব কাজের বিবরণ জানিয়ে *ভূমিলক্ষ্মী* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এছাড়া ছাত্ররাও *চাষা* নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ করত। এই পত্রিকাগুলি আমরা দেখার সুযোগ পাইনি। তবে আশ্রমপত্রিকা *শান্তিনিকেতন* এবং বিশ্বভারতী বুলেটিনের বিভিন্ন সংখ্যা থেকে শ্রীনিকেতনের কাজের ব্যাপ্তি সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পাই। যেমন ২৮নং বুলেটিন (সেপ্টেম্বর, ১৯৪০) থেকে সুপুর গ্রামে ব্রতীবালকদের কাজের কিছু সংবাদ পাই। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত ৩২ নং বুলেটিন থেকে জানতে পারি, ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত শিল্পভবনে কতধরনের হাতের কাজ শেখানো হচ্ছে। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় পড়ি, ১৯২৮ সালে 'আদিবাসী সহায়ক সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল; ১৯৩৪ সালে পাঁচটি সাঁওতালপল্লি নিয়ে গঠন করা হয় 'সাঁওতাল কেন্দ্র ও পল্লীসেবা সমিতি'। আরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে উমা দাশগুপ্ত, সত্যদাস চক্রবর্তী প্রমুখের রচনায়। আমরা এখানে আর-একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই আলোচনা করব: স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি।

গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্য-সচেতনা প্রসারের কাজ আগে শান্তিনিকেতনেই শুরু হয়েছিল এবং এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কালীমোহন ঘোষ। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, শান্তিনিকেতনের ছাত্ররাও জঙ্গল-পরিষ্কার, নালা-কাটা, কুয়ো-খোঁড়া ইত্যাদি গ্রাম-সংস্কারের কাজে উদ্যোগী হয়েছিল। শান্তিনিকেতন এবং সুরুলে কূপখননের কাজে হাত লাগান শিক্ষকরাও। ১৯২১ সালে কেন্দুলির মেলায় স্লাইড-সহযোগে ম্যালেরিয়া এবং বসন্তরোগ-নিবারণের বিষয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন কালীমোহন ঘোষ।

শ্রীনিকেতন স্থাপনের পর এইধরনের কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়। ধীরানন্দ রায়ের কাছ থেকে ছাত্ররা স্কাউট ট্রেনিং নিয়েছিল। তারা গ্রামে-গ্রামে স্বাস্থ্যচেতনা বিষয়ে প্রচার শুরু করে। ১৯২২ সালেই শ্রীনিকেতনে স্থাপিত হয় একটি স্বাস্থ্য-পরিষেবা কেন্দ্র বা হেল্‌থ ক্লিনিক। এই কেন্দ্রটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন গ্রেচেন গ্রীন নামে এক বিদেশিনী। গ্রীন ১৯২৬ সাল পর্যন্ত শ্রীনিকেতনে থেকে ওই কেন্দ্রে সেবিকার কাজ করতেন। *শান্তিনিকেতন* পত্রিকা (অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) থেকে জানতে পারি, ওই ক্লিনিক থেকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে অন্তত ১০০ জন গ্রামবাসীকে চিকিৎসা-পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পি. সি. লাল তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পৃ. ১২৭-২৯), ছাত্রদের প্রচার এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাহায্যে ওই অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেকটাই কমানো সম্ভব হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আর-একজন বিদেশীর ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা উচিত; তিনি হলেন প্যাট্রিক গেডেস। বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদ গেডেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল বিদেশে, ১৯১৫ সালে। শান্তিনিকেতনে কবির কর্মোদ্যোগের কথা শুনে তিনি খুবই উৎসাহিত বোধ করেন। তিনি নিজে শান্তিনিকেতন এসেছিলেন এবং তাঁর পুত্র আর্থার কিছুদিন শ্রীনিকেতনের কাজের সঙ্গে যুক্তও হয়েছিলেন।

সমবায়-ব্যবস্থা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তো সেই *স্বদেশী সমাজ* বক্তৃতার সময় থেকেই (১৯০৪) চিন্তাভাবনা করছিলেন; এ-বিষয়ে কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন বিভিন্ন সময়ে। ১৯২৭ সালে শান্তিনিকেতনে একটি সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালে শ্রীনিকেতনের কয়েকটি গ্রামে যে-ধরনের 'স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি' (হেলথ কো-অপারেটিভ সোসাইটি) গড়ে উঠল, এক কথায় তা এক অনন্যসাধারণ প্রয়াস। এই সমিতি গঠনের পিছনেও কালীমোহন ঘোষের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। সমিতিটি কীভাবে কাজ করত, গ্রামবাসীদের তা কতটা প্রভাবিত করেছিল—তারই একটি রূপরেখা আমরা এখানে উপস্থিত করছি বিশ্বভারতী বুলেটিনের সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

বুলেটিনের ২৫ নং সংখ্যাটি (১৯৩৮) থেকে 'স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি' সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। বলা হচ্ছে, এই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য : 'বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা এবং তাদের চিকিৎসা-পরিষেবা দেওয়া।'

গ্রামবাসীরা চার আনা করে চাঁদা দিয়ে সমিতির সদস্য হলে এই পরিষেবার সুযোগ পাবে। প্রথম বছর (১৯৩৩) চাঁদা আদায় হয়েছিল ৩১২ টাকার কিছু বেশি। এছাড়া ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা. পি. সরকার রোগীদের বাড়ি গিয়ে কল-ফী বাবদ আরও ১১৩ টাকার মতো উপার্জন করেন।

১৯৩৪ সালে চাঁদা আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০ টাকার মতো। তার মানে সদস্য-সংখ্যা বেড়েছে, ধরে নেওয়া যায়। ১৯৩৬-৩৭ সালে সাড়ে ১৪ হাজারের মতো অসুস্থ মানুষ এই সমিতি থেকে চিকিৎসা-সাহায্য পেয়েছিল; এছাড়া আরও প্রায় দু-হাজারের মতো রোগীকে ডাক্তারবাবু বাড়িতে গিয়ে দেখে আসেন। ম্যালেরিয়া এবং আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাই ছিল বেশি। এছাড়া শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, যৌনরোগ এবং কালাজ্বরের প্রকোপও লক্ষ করা যায়। বাহরি এবং বাঁধগোড়া গ্রামের স্বাস্থ্যসমিতির ছবিও এই বুলেটিনে ছাপা হয়। বাহরিতে গ্রামের লোক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ছবিতে দেখতে পাই।

২৮নং বুলেটিন (১৯৪০) থেকে জানা যাচ্ছে, ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের দাপট গ্রামে যথেষ্টই আছে। ব্রতীবালকের দল গ্রামে-গ্রামে রোগ-নিবারণের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পরিবারগুলিতে শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। প্লীহা বড়ো-হয়ে-ওঠা রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাদের রোগটা ম্যালেরিয়া নয়, কালাজ্বর।

১৯৪০-র দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত স্বাস্থ্যসমবায় সমিতিগুলি ভালোভাবেই চলছিল, মনে হয়। তারপর অর্থাভাবে এবং উদ্যোগের অভাবে শ্রীনিকেতনের অন্যান্য কাজের সঙ্গে এই অভিনব প্রয়াসটিরও অবনতি হতে শুরু করে।

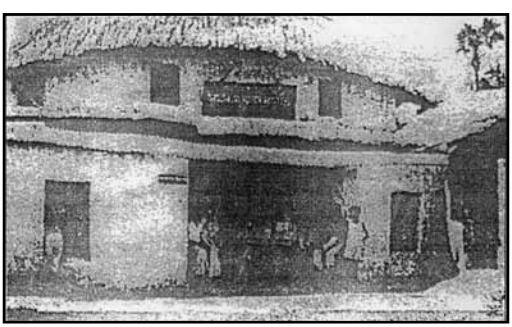

বাঁধগোড়া স্বাস্থ্যসমবায়

পরিশিষ্ট

১. রবীন্দ্রনাথ যৌনশিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেই কারণেই ওই ভাষণের আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগারে যৌনবিজ্ঞান-সংক্রান্ত বইও রাখা হয়েছিল। তবে বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং আরও দু-একজন তারাপুরওয়ালার ভাষণ পছন্দ করেননি। (পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল,* ৪র্থ খণ্ড; পৃ. ৬৩৩)

২. ১৯৩৭ সালে নন্দলাল বসু 'কারুসঙ্ঘ' নামে একটি কেন্দ্র গড়ে তোলেন প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায়। ছাত্রদের তৈরি মূর্তি, সূচিশিল্পের কাজ, বাসন-গহনার ডিজাইন এবং তাদের আঁকা ছবি বিক্রি করা হবে—এই ছিল ওই কেন্দ্রটি স্থাপনের উদ্দেশ্য। মণীন্দ্র গুপ্ত, রামকিঙ্কর বেইজ, ইন্দুসুধা ঘোষ প্রমুখ কলাভবনের শিল্পী এবং শ্রীনিকেতনের বিনায়ক মাসোজি-ও এই উদযোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। (দ্র. পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৬-৮৭।

৩. অধ্যাপক যদুনাথ সরকার কিন্তু শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপ্রণালী পছন্দ করেননি, তাঁর মনে হয়েছিল, এই শিক্ষায় 'exact knowledge'-কে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মে-জুন, ১৯২২ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময় হয়েছিল এই বিষয়ে। (দ্র. *মানবমন* পত্রিকা, জুলাই, ১৯৯৯)।

সংযোজন

২০১২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়-শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। নতুন-করে-লেখা পাঠ্যবইগুলিতে নতুন একটি চিন্তাধারা বা অ্যাপ্রোচ লক্ষ করা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন অবশ্যই শুভ লক্ষণ। তবে পাঠ্যবিষয়ের ভার বিশেষ কমেনি। কী জানব , কতটুকু জানব এবং কীভাবে জানব-শিক্ষাতত্ত্বের এই মৌলিক প্রশ্নগুলিতে কোনো বড়োধরণের পরিবর্তন আসেনি। মান্যভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীভাষাগুলিকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য কোনো পরিসর-ও সৃষ্টি করা হয়নি। তবে প্রকৃতি – পরিচয় এবং ইতিহাস – ভূগোলের মতো বিষয়ের পাঠ্যবইগুলি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় হয়েছে। বাঙলাশিক্ষার পাঠ্যবইগুলিতে আধুনিক লেখকদের রচনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সে-হিসাবে পাঠ্যবইগুলির সাবেকি চেহারা অনেকটাই বদলেছে। তবে শহরের মধ্যবিত্ত দৃষ্টিকোণের প্রাধান্য কিন্ত রয়েই গেছে।

শিক্ষা রাষ্ট্রচালনার একটা হাতিয়ার। কোনো রাষ্ট্রই শিক্ষার ভেতর দিয়ে স্বাধীন চিন্তাকে খুব বেশি প্রশ্রয় দিতে চায় না। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধিজী যেভাবে চিন্তা করেছিলেন, সেইধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা আজ হয়তো সম্ভব নয়। গ্রামের জন্যে স্বতন্ত্র পাঠক্রম, স্বতন্ত্র শিক্ষাপদ্ধতি গ্রামের মানুষই আজ আর চাইবেন না। গ্রামের মানুষের আকাঙ্ক্ষার ধরন-ও আজ অনেক বদলে গেছে, সেটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে শিক্ষা একটা রাজনৈতিক বিরোধের বিষয় হয়ে উঠুক – এটাও কোনো রাষ্ট্র স্বভাবতই চাইবে না। তবে ছোটো আকারে হলেও প্রতিষ্ঠানের বাইরে যাঁরা শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা থেকে তাঁরা কিছু প্রেরণাসূত্র পেতে পারেন।

সম্পূর্ণ রচনাপঞ্জি

(অন্য কোনো উল্লেখ না থাকলে প্রকাশক : বিশ্বভারতী)

১. অজিতকুমার চক্রবর্তী, *ব্রহ্মবিদ্যালয়,* ১৩৫৮ব।

২. অমিতা সেন *শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা,* টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, (টি আর আই) ১৯৭৯।

৩. উমা দাশগুপ্ত, *শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন,* ১৩৯১ ব।

৪. এল. কে. এলম্‌হার্স্ট, *রবীন্দ্রনাথ টেগোর : পাইয়োনিয়ার ইন এডুকেশন,* জন মারি, ১৯৬১ : *পোয়েট অ্যান্ড প্লাউম্যান,* ১৯৭৫।

৫. এম. এক. গান্ধি, *বেসিক এডুকেশন,* নবজীবন, আহমেদাবাদ; ১৯৫১ সং। *অ্যান অটোবায়োগ্রাফি,* ঐ, ১৯৯৫ নং।

৬. কালীপদ রায়, *শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ,* টি আর আই, ১৯৮১।

৭. জগদানন্দ রায়, *'স্মৃতি',* বিশ্বভারতী পত্রিকা [বিভাপ] মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ ব।

৮. চিত্তরঞ্জন দেব, *'শ্রীনিকেতন পরিচয়',* চিত্রকারু ১৩৬৮ ব।

৯. ডবলিউ ডবলিউ পিয়ারসন, *'শান্তিনিকেতন',* অনুবাদ : অমিয়কুমার সেন। বিভাপ, মাঘ-চৈত্র ১৩৭০ব; বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭১ ব।

১০. পি. সি. লাল, *রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এডুকেশন ইন রুরাল ইন্ডিয়া,* অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯৩২।

১১. পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল* ২য়, ৪র্থ খণ্ড (১৯৯৩); রাঢ় গবেষণা পর্ষদ, বীরভূম।

১২. প্রণতি মুখোপাধ্যায় *শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম,* টি আর আই, ১৩৭৯ব।

১৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-জীবনকথা,* ১৯৬১; *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক* ৩য় খণ্ড, ১৩৫৯ব। *শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী,* বুকল্যান্ড, ১৯৬২।

১৪. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন,* ১৯৬৫।

১৫. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* পঞ্চম খণ্ড (১৯৯০), ষষ্ঠ খণ্ড (১৯৯৩), সপ্তম খণ্ড (১৯৯৭); আনন্দ পাবলিশার্স।

১৬. প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, *'গ্রাম সংগঠনে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ'* (দ্র. রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭)।

১৭. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি,* জিজ্ঞাসা ১৯৯৩ব সং।

১৮. *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : শিক্ষাচিন্তা,* সম্পাদনা : সত্যেন্দ্রনাথ রায়; গ্রন্থালয়, ১৯৮২।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি,* ১৯৬১ সং; *জীবনস্মৃতি,* ১৩৯৩ব সং; *সংকলন* ১৯৬৮ সং; *পল্লীপ্রকৃতি,* ১৯৮৬ সং; *ইংরেজী সোপান* ৩য় সং, ১৩২০ব; *শিক্ষা,* ১৩৫১ব সং।

২০. *শিক্ষাসত্র* (সংকলন), বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন, ১৯৮৪।

২১. লীলা মজুমদার, *আর কোনোখানে,* মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯১ব সং।

২২. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ,* জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪।

২৩. শান্তিদেব ঘোষ, *ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি,* ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৩৬২ ব।

২৪. সব্যসাচী ভট্টাচার্য-সম্পাদিত *দ্য পোয়েট অ্যান্ড দ্য মহাত্মা,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৭।

২৫. সুধীরঞ্জন দাস, *আমাদের গুরুদেব,* ১৯৬৩; *আমাদের শান্তিনিকেতন,* ১৩৬৬ ব।

২৬. সুনীলচন্দ্র সরকার, *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা,* মৈত্রী, ১৯৬৪; *টেগোর'স এডুকেশনাল ফিলজফি অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট,* ১৯৬১।

২৭. সুধীরচন্দ্র কর, *শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা,* ওরিয়েন্ট বুক কোং, ২য় সং, ১৩৬৪ ব।

২৮. সত্যদাস চক্রবর্তী, *শ্রীনিকেতনের গোড়ার কথা,* সুবর্ণরেখা, ১৯৮৫।

২৯. সুকুমার মল্লিক, *রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা,* নবপত্র, ১৯৮২।

৩০. সুধাকান্ত রায়চৌধুরী *'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি'* (দ্র. রবীন্দ্রস্মৃতি; সম্পাদনা : বিশ্বনাথ দে।); ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬১।

৩১. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রীনিকেতন : রবীন্দ্রনাথ'স পেডাগজি ইন প্র্যাকটিস,* ২য় সং; আর্থকেয়ার, ২০০৭। *'শান্তিনিকেতন : শতবর্ষ পরে',* অনুষ্টুপ পত্রিকা শারদীয় ২০০১; *'শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্র',* ধনধান্যে পত্রিকা, এপ্রিল ২০০২।

৩২. সৈয়দ মুজতবা আলী, *গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন,* মিত্র ও ঘোষ, ১৯৮১।

৩৩. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ,* ১৪০৬ব।

৩৪. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *শান্তিনিকেতনের এক যুগ,* ১৯৮০।

৩৫. হাসিম আলি, *দেন অ্যান্ড নাউ,* এশিয়া পাবলিশিং, ১৯৬০।

৩৬. সাইকস, মারজোরি, *দ্য স্টোরি অফ নঈ তালিম,* ওয়ার্ধা, ১৯৮৮।

শিক্ষাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ

১. ইলিচ, রবার্ট-সম্পাদিত, *হিস্টরি অফ এডুকেশনাল থট,* আমেরিকান বুক কোম্পানি, ১৯৫০।

২. ওলসন, ডি. আর-সম্পাদিত, *লিটারেসি, ল্যাংগোয়েজ অ্যান্ড লার্নিং,* কেমব্রিজ, ১৯৮৫।

৩. গার্ডনার, হাওয়ার্ড, *ফ্রেমস অফ মাইন্ড,* হাইনিম্যান, ১৯৮৪।

৪. চমস্কি, নোয়ম, *রিফ্লেকশনস অন ল্যাংগোয়েজ,* ১৯৭৬; *ল্যাংগোয়েজ অ্যান্ড দ্য প্রবলেম্‌স অফ নলেজ,* এম আই টি, ১৯৮৮।

৫. হ্যালিডে, এম. এ. কে, *ল্যাংগোয়েজ অ্যাজ সোস্যাল সেমিওটিক,* এডওয়ার্ড আরনল্ড, ১৯৮৭।

৬. স্টাইনার, রুডলফ, *ওয়ালডর্ফ,* ১৯৮০।

নথিপত্র

১. বিশ্বভারতী বুলেটিন : ১৯ (১৯৩৫); ২১ (১৯৩৬); ২৫ (১৯৩৮); ২৮ (১৯৪০); বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৪৯; বিশ্বভারতী নিউজ (১৯৫৭)।

২. *রুরাল সার্ভে : বল্লভপুর,* সম্পাদনা : কালীমোহন ঘোষ। ভিলেজ ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, বিশ্বভারতী; জুলাই ১৯২৬।

৩. *শিক্ষাসত্র* (বিভিন্ন রচনার সংকলন), ১৯৮৪।

৪. *শিক্ষাসত্র স্মারকপত্র,* শ্রীনিকেতন ১৯৮৪

৫. *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : শান্তিনিকেতন* (আশ্রমপত্রিকার সংকলন), সম্পাদনা : সুপ্তি মিত্র; টি আর আই, ১৯৮০।

৬. *ভুসম্পদের বিত্তহরণ* : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদনা : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ('দ্য রবারি অফ দ্য সয়েল' রচনার মূল পাঠসহ বাঙলা অনুবাদ); মুক্তমন, ২০০৬।

৭. *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় লোকশিক্ষা ও শিক্ষাসত্রের সম্ভাব্য ভূমিকা* (রচনা-সংকলন), শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন, ১৯৮৪।

৮. পুলিনবিহারী সেন-সম্পাদিত *রবীন্দ্রায়ণ,* প্রকাশ ভবন, ১৯৬১।

একটি নবদিশা প্রকাশনা

গ্রামবাংলার শিক্ষাঙ্গনে, প্রচলিত
শিক্ষার সঙ্গে আঞ্চলিক জীবনযাপন
ভিত্তিক শিক্ষার সংযোজন।
আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে
সংযোজিত শিক্ষার মুল ভিত্তি।
সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্ব-শাসিত
সরকার এর বাস্তব রূপায়নে সক্ষম হবে।

AHEAD Initiatives
Addressing Hunger Empowerment And Development